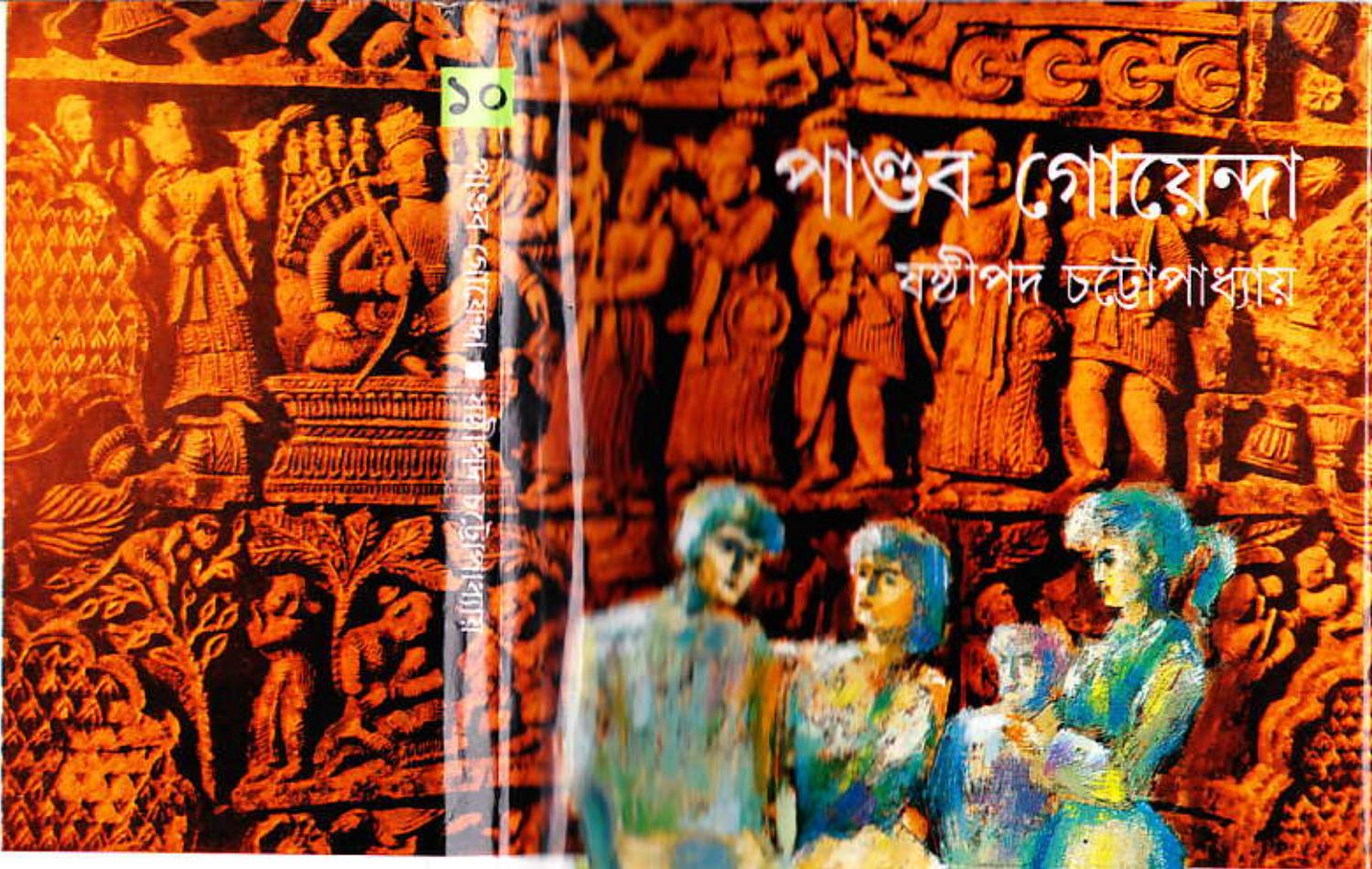


ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়  
**পাঞ্চব  
গোয়েন্দা**



9 788172 151782

গাঁওর গোহেন্দা

# পাঞ্চব গোয়েন্দা

দশম খণ্ড  
একবিংশ অভিযান

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়



গৌরব ভট্টাচার্য  
মেহাম্পদেয়

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত  
মুদ্রণ সংখ্যা ১৮০০  
পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

© যষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায়

#### সর্বপ্রথম সংরক্ষিত

প্রকাশক অবৃ প্রযোজনীয়ার দিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেই কোনও রূপ  
পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কেন্দ্র ও মাইক্রো উপায়ের (আধিক, ইলেক্ট্রনিক বা অন্য  
কেন্দ্র মাধ্যম, যেমন মেটেক্সি, ট্রেল বা পুনরুৎপাদনের সুযোগ সরবরাহিত তথা-সংক্রয় করে  
রাখা ক্ষেত্রে পক্ষতি) যাত্রায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কেন্দ্র ইলেক্ট্রনিক, ট্রেল, প্রারম্ভের চেতুড়  
মিতিয়া বা কোনও তথা সংবর্জনের যাহুড়ি পক্ষতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত  
লঙ্ঘিত হলে উপন্যাস অইনি ব্যবহাৰ প্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-178-0

আনন্দ প্রকাশনা প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪২ বেনিয়াটোনা লেন  
কলকাতা ৭০০ ০৩৯ থেকে সুরীরক্ষার নিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং  
প্রয়োগিক ও প্রাক্তন প্রাইভেট লিমিটেড  
৪২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯  
থেকে প্রক্রিত।

১০,০০

শীত বিদায় নিলেও বাগানের গাঁদাগাছগুলো কিন্তু এখনও ফুলে-ফুলে ভরে আছে। কী জাতের গাঁদা তা কে জানে? বড়-বড় থোকা-থোকা ফুল। বিচ্ছু একটা চারাগাছ কোথা থেকে যেন নিয়ে এসে বসিয়েছিল। তারপর তাকে কী যত্ন! গাছ বড় হল। সেই গাছের ডাল ভেঙে আরও গাছ হল। তাই থেকে আরও গাছ। বাগান ভরে উঠল। ফুলের সে কী বিচ্ছি বাহার!

রোজের মতো সেদিনও বিকেলবেলা পঞ্চকে নিয়ে মিত্রদের বাগানে ফুলের শোভা দেখছিল বাবলু। বিলু, ভোঁসল আসেনি বলে রাগ হচ্ছিল ওর। বাচ্চু, বিচ্ছুর আসতে দেরি হবে। কেননা বাচ্চুর গানের বিদ্যমণি আজকাল এই সময়ে আসেন, আর বিচ্ছু যায় নাচের স্থুলে। কাজেই ওদের আসতে দেরি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিলু, ভোঁসল দেরি করছে কেন?

একা-একা বাবলুর যখন খুবই বিরক্ত লাগছে তেমন সময় হঠাৎই বিলুকে আসতে দেখল।

বিলু এসেই বলল, “বাবলু! তুই ভূত বিশ্বাস করিস?”

বাবলু বলল, “পাওব গোয়েন্দাদের কাছে কুসংস্কারের কোনও স্থান নেই।”

“না-না। সত্তি করে বল না, তুই করিস কি না?”

বাবলু কী যেন একটু ভেবে বলল, “না। করি না।”

“তা হলে আমাদের বাড়িতে একবার আয়। একটা চমকে ওঠার মতো কাহিনী শুনতে পাবি।”

“কীরকম!”

“আয় না।”

এই নেখকের অন্তর্দশ বই

পাওব গোয়েন্দা ৭

পাওব গোয়েন্দা ৮

পাওব গোয়েন্দা ৯

সোনার গণগতি হিরের চোখ

“ভোঞ্জল কোথায় ?”

“মে আমাদের বাড়িতে তোর জন্ম অপেক্ষা করছে ।”

বাবলু ডাকল, “পঞ্চ !”

পঞ্চ একটি ঘোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওর কাছে । তারপর বিলুকে দেখেই দু’ পায়ে খাড়া ।

বিলু ওর মুখে একটা বিস্তু ঝঁজে দিয়ে বাবলুকে বলল, “আয় ।” যেতে-যেতে বলল, “এতদিন ধরে আমরা কত রহস্যের জলে কতভাবেই না জড়িয়েছি, কিন্তু এ এমন এক রহস্য যে, একে একটা ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই বলা যায় না ।”

“বলিস কী ?”

“সত্যি বলছি । এমন ঘটনা রহস্যকাহিনীতেও নেই ।”

“একটু আভাস দে শুনি ?”

“ধীরে বকু, ধীরে । শোনাব বলেই তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি ।”

বাবলু বুঝল বিলু এখন কিছুই বলবে না । অতএব কাহিনী শোনার জন্য ধৈর্য একটু ধরতেই হবে । তাই প্রথমেই ওরা বাচ্ছ, বিছুদের বাড়ি এল । বাচ্ছ তখন সদা-শেখা রবিশ্রমস্থীতের একটি কলি আপনমনেই গুন্ডুন করে গাহিছিল । ওদের দেখেই বলল, “কী ব্যাপার ! মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন হয়েছে ?”

বিলু বলল, “বিছু ফিরেছে ?”

“না । এখনই এসে পড়বে ।”

“ও এলেই আমাদের বাড়িতে চলে আয় । বুব জরুরি ।” বলেই চলে এল ওরা ।

বৈঠকখানায় একটা সোফায় বিলুর বাবা, মা পাশাপাশি বসে ছিলেন । তাঁদের পাশেই আলাদা একটি কোচে বসে ছিলেন এক সুদৰ্শন ভদ্রলোক । জমিদার চেহারা । পরনে ধূতি-পঞ্জাবি, নকশাদার জওহর কেট, মাথায় কাঞ্চিরি টুপি । বনেদি বড়লোক থাকে বলে । ওরা যেতেই ভদ্রলোক একবার তাকিয়ে দেখলেন ।

ভোঞ্জল বসে ছিল একপাশে চুপ করে । ওদের দেখল, কিন্তু কিছু বলল না ।

ওরা যাওয়ামাত্রই বিলুর বাবা বললেন, “আমার সহকর্মী বিজয় এই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন । হাওড়া জেলার জগৎবঞ্চানপুরে থাকেন । উনি এমন একটা ঘটনার কথা বলবেন তোমাদের, যা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে । বিজয়ের মুখে তোমাদের নাম শুনেই এসেছেন উনি । এখন সব শুনে তোমরা একটু ভাবনা-চিন্তা করে দেখো, এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারো কি না ।”

বাবলু বলল, “বেশ তো । শুনি আগে কী ব্যাপার !”

বিলুর মা বললেন, “দাঁড়াও । তোমাদের জন্মে চা নিয়ে আসি ।”

ঘরে তখন সূচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি । কী এমন রহস্য যে, সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে ?

বসে থাকতে-থাকতেই বাচ্ছ, বিছু এল ।

বিলুর মা চা-বিস্তু নিয়ে এলেন ।

ভদ্রলোক বললেন, “আমার নাম অধিকা সেন । আমার একমাত্র মেয়ে সংযুক্ত তোমাদেরই বয়সী । কিছুদিন আগে বড়দিনের ছুটিতে সে তার কয়েকজন বাক্ফারীকে নিয়ে আমাদের প্রামেই কানা নদীর ধারে পিকনিক করতে যায় । পিকনিকে গিয়েই নিখেঁজ হয় সে । বাড়িতে কামাকাটি পড়ে যায় । ওর বাক্ফারীদের হাজার ডিজাসা সঙ্গেও কোনও সদৃত পাওয়া যায় না । অবশ্যে কয়েকদিন পরে এই নদীতেই তার মৃতদেহ ভেসে ওঠে । ঢেকের জলে বুক ভাসিয়ে আমাদের একমাত্র মেয়েকে আমরা চিনায় তুলে দিই । তারপর বেশ কিছুদিন পার হয়ে যায় । আমাদের সুখের ঘরে দুঃখের প্রদীপ জ্বলতে থাকে টিমটিম করে । হঠাৎ সেদিন এমন একটা চিঠি এল, যা পড়ে আমি নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছি না ।”

বাবলু বলল, “কী চিঠি ! দেখি ?”

“এই দ্যাখো ।”

বাবলু চিঠি পড়েই অবাক । তাতে লেখা ছিল, “বাপি, তোমরা হ্যাতো আমার ওপর খুব রাগ করেছ । তোমাদের না জানিয়ে এইভাবে চলে

এসে আমি খুব ভুল করেছি। এখন আমি পাটনায় আছি। রোজ বিকেলে মহেন্দ্রঘাটের কফি হাউসে বসে গন্ধুর শোভা দেখি। জয়গঠা খুব ভাল। কিন্তু বাপি, আমাকে তোমরা চিনতে পারলে না? ভুল করে কাকে পুড়িয়ে দিলে? হতি—সংযুক্ত।”

বাবলু বলল, “স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু একটা কথা, এই চিঠির হাতের সেখার সঙ্গে আপনার দেয়ের কোনও লেখাপত্রের মিল আছে কি দেখেছেন?”

“অবশ্যই। এই দাখো।” বলে কোলা ব্যাগ থেকে একটা খাতা বের করে দেখালেন।

বাবলু এক নজরেই দৃঢ়ে নিল দৃষ্টি লেখাটি একই হাতের। বলল, “মেয়ে আপনাকে চিঠি লিখেছে, কিন্তু মজার ব্যাপার, চিঠিতে কোনও ঠিকানা দেয়নি।”

“তা হলে আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ তো?”

“পারছি। তবে এই চিঠিটা যদি আপনার মেয়েরই হয় তা হলে একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, মেয়েটা আপনার বেঁচে আছে। আপনার দৃঢ়ের মরুভূমিতে এই মরীচিকটিকুই বা কম কী?”

অধিকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ। এটা একটা মন্ত বড় সাম্ভুন বটে। তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা এত লোক গিয়ে যাকে নিজের মেয়ে মনে করে চিতায় তুলে দিয়ে এলাম, সে তা হলে কে? তা ছাড়া যে-মেয়ে আমাদের দু'জনকে ছাড়া এক দণ্ড থাকতে পারত না, সে ওইভাবে পালাবেই বা কেন? পালাতে গেলে সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকা চাই। তার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না। যা আমার একবস্ত্রে কোন অভিমানে চলে গেল?”

বাবলু সংযুক্তার চিঠিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেশ ভালভাবে ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, “আপনি বলছেন এই হাতের লেখা আপনার মেয়েরই?”

“শুধু আমি নয়, ফরেনসিক রিপোর্টও তাই বলছে।”

“বলেন কী? আপনার মেয়ে লিখেছে, সে এখন পাটনায় আছে। কিন্তু একটু লক্ষ করে দেখেছেন কি, খামের ওপর পাটনার কোনও ছাপ নেই। ছাপ আছে নাগপুরের।”

১০

“নাগপুরের! সে কী! দেখিন তো!”

“এই দেখুন।” বাবলু চিঠিটা অধিকাবাবুর হাতে দিল।

অধিকাবাবু পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে বললেন, “কোথায় পাটনা, কোথায় নাগপুর! এ কী করে সন্তুষ্ট!

“হয়তো যাকে পোস্ট করতে দিয়েছিল তিনি কোনও কারণে চিঠিটা পোস্ট করেননি। কোনও কাজে নাগপুরে এসেছিলেন, সেখানেই পোস্ট করেছেন।”

অধিকাবাবু বললেন, “আমি থানাতেও জানিয়েছি ব্যাপারটা। পুলিশও এই রহস্যের কোনও বিনারা করতে পারছে না। কেউ-কেউ এটাকে ভুতুড়ে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। আমি কিন্তু ব্যাব ওসব বিশ্বাস করি না। আমার মেয়েকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছি।”

“স্বাভাবিক। ধরে নিতে হবে আপনার মেয়ের মতন দেখতে আর একজন কেউ মরে ভেসে উঠেছিল এবং আপনি তখন এমনই বাহ্যজ্ঞানীয় হয়ে ছিলেন যে, ভালভাবে শনাক্ত না করেই নিজের মেয়ে তেবে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন তাকে।”

“ঠিক তাই। তা ছাড়া ওর দেহটাও তখন...।”

“বর্ণনা প্রয়োজন নেই। কোথাও না কোথাও ভুল একটু হয়েছিল আপনাদের। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে বেঁচেই আছে। তবে কেনই বা সে পালাল আর কেনই বা এইভাবে ঠিকানা না দিয়ে লুকোচুরি খেলছে, সেইটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।”

“ভাবতে গেলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমার মেয়ে একা-একা কখনও কোথাও যায়নি। যা গেছে তা ওর স্কুলের বাস্কুলারীদের সঙ্গে, নয়তো আমাদের সঙ্গে। সে কী করে অত দূরে যাবে বলো তো? কেউ যদি ওকে চুরি করেও নিয়ে যেত, তা হলে সে নিশ্চয়ই ওর বিনিময়ে আমার কাছে টাকা চাইত। সবচেয়ে আশ্চর্য, অন্য একটি মেয়ের মৃতদেহই বা সেই সময় ওইখানে এল কী করে? ওই এলকার আশেপাশে যেসব গ্রাম আছে এই চিঠি পাওয়ার পর আমি নিজে দিয়ে খৈঁজিবার নিয়ে জেনেছি, কয়েক বছরের মধ্যে ওইরকম ব্যাসের কোনও মেয়েই নিখোঁজ হয়নি সেখান থেকে।”

বাবলু দু' হাতে চুলটাকে মুঠো করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, “এই ঘটনার কথা পাঠনার পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছেন?”

“জানিয়েছি। এখানকার পুলিশ মারফতই জানানো হয়েছে। তবে জানিয়ে লাভটা কী? এটা একটা উড়ো চিঠি বই তো নয়। ওরা তো হ্যাসছে। এমনকী এখানকার পুলিশও বলছে, আমি নিজেই যেগামে নিজের মেয়েকে মৃত ঘোষণা করেছি, সেখানে আর নাকি তাদের কিছি করবার নেই।”

“বাঃ! চমৎকার।”

“সবচেয়ে বড় কথা, পুলিশ এখন আমাকেই ধর্মকাছে। বলছে, কেন আপনি তা হলে সেদিন ওই ডেডবিডিটাকে নিজের মেয়ে বলে শনাক্ত করেছিলেন। আপনার তো জ্বেল হওয়া উচিত। এখন আপনার মেয়ে জীবিত থাকলেও অনোর মেয়েকে খুন করার অপরাধে আপনার শাস্তি হওয়া উচিত। আপনিই প্রমাণ লোপের জন্যে নিজের মেয়েকে অনাত্ম সরিয়ে রেখে নাটক সৃষ্টি করছেন। কিছুদিন পরে চালাকি করে নিজের মেয়েকে ঠিকই ফিরিয়ে আনবেন। মাঝখান থেকে ও মেরেটির মতো পরিচয়ও লোপ পেয়ে যাবে।”

বাবলু বলল, “পুলিশ এ কথা বলতেই পারে। ওই একই প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম।”

অধিকাবাবু কেন্দে উঠে বললেন, “কিন্তু বাবা, একটা কথা তেমনই বলো, কোনও বাবা কি কখনও নিজের মেয়ের জীবন নিয়ে এমন খেল খেলতে পারে?”

“কোনও বাবা যে চৰম মুহূর্তে এইরকম ভূল করেন, তাও আমাদের জানা ছিল না।” বলেই বলল, “দেখুন, আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি না। তবু এইসব প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেননা ব্যাপারটা খুবই জটিল। দেখি, আমরা কত দূর কী করতে পারি। আপনার মেয়ের দু-এক কপি ফোটো আমাদের দিতে পারেন?”

“দু-এক কপি কেন, পুরো অ্যালবামটাই দিতে পারি তোমাদের।”

“বেশ। আমরা একবার জগৎবন্ধুর পিয়ে আপনার বাড়িটা দেখে আসব। সেইসঙ্গে দেখে আসব সেই কানা নদীর ধার। ওর স্তুলের ১২

বাবুবীদের সঙ্গেও একটু কথাবার্তা বলে দেখব।”

“খুব ভাল কথা।”

“আমরা কাল দুপুরের দিকে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি।”

“যখন ইচ্ছ যেয়ো। মোট কথা, যেভাবেই হোক আমার মেয়েটাকে উদ্ধার করো তোমরা। তারপর আর এখানে নয়। এবার সন্ত লেকেই ফিরে যাব আমি।”

“সন্ত লেকে? সেখানে কে আছেন আপনার?”

“সেখানে আমি নতুন একটা বাড়ি কিনেছি। কিছুদিন বাসও করেছিলাম। তারপর বাবা মারা গেলে বছর দুই আগে পাকাপাকিভাবে এখানে চলে আসি। কেননা, বিস্তর জমি-জমা আমাদের। এসব দেখাশোনা করবার একজন লোক তো জাই। আমর আর এক ভাই আছে, ডাক্তার। সে থাকে বন্ধের কাছে নাসিকে। তার পক্ষে সেখান থেকে এসে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। এদিকে দেশের অবস্থাও খারাপ। কখন কোন জমি বেদখল হয়ে যায় তা কে বলতে পারে? তাই আমি পাকাপাকিভাবেই গ্রামে রয়ে গেলাম।”

“আপনি যখন সন্ত লেকে থাকতেন তখন আপনার বাবার দেখাশোনা করতেন কে?”

“আমর বাবার বক্স। আমাদের পুরনো নায়েবমশাই। তাঁরও বয়স হয়েছে। তবে তিনি একটু খিচিটি এবং বদমেজাজি বলে আমি তাঁকে খুব একটা পাতা দিই না। আর আছে কাজের লোক ভজহরি। অত্যন্ত অনুগত।”

“ঠিক আছে। আমরা কীভাবে যাব, না-যাব একটা কাগজে লিখে দিন। কালই আমরা যাচ্ছি।”

অধিকাবাবু একটা সাদা কাগজে জগৎবন্ধুর পিয়ে ঠিকানা এবং পথনির্দেশিকা লিখে দিলেন। বাবলু কাগজটা পকেটে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল তখন কারও মুখ্যে কথা নেই।

সে-বাবে জোর আলোচনায় মেতে উঠল পাণ্ডির গোয়েন্দারা। আলোচনার বিষয় হল, কোনও বাবা-মা কি কথনও নিজের সন্তানকে চিনতে ভুল করেন? যদিও ধরা যেতে পারে, কয়েকদিন পরে দেহটা অস্বাভাবিক রকমের থারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আর অতটা মনোযোগ দেননি, তবুও অন্যান্য লোকজন যারা ছিল, তারাও ওই একই ভুল করল কী করে? তা ছাড়া উড়ো চিঠির সূত্র ধরে সংযুক্তকে মৃত মনে না হলেও সংকার করা লাশটির কোনও দাবিদার নেই কেন? আর কেউ যদি সংযুক্তকে লুকিয়েই রাখে, তা হলে তার মৃত্তির বিনিময়ে টাকা-পয়সাই বা চাইছে না কেন? প্রশ্নের পর প্রথম তুলে, যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করেও পাণ্ডির গোয়েন্দারা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। তরা ছেলেমানুষ হলেও অভিজ্ঞতা ও দের অনেক। তবুও এই ব্যাপারে এই কুটিল রহস্যজাল ওরা যে কীভাবে উন্মোচন করবে তা ভেবে পেল না কিছুতেই।

বিলু বলল, “আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।”

বাবলু বলল, “আমারও। যতবার ব্যাপারটাকে অন্যরকমভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করছি, ততবারই ভাবনাচিন্তাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে অস্বিকাব্যবুর সঙ্গে আরও খেলাখুলিভাবে আমাদের আলোচনা হওয়া দরকার।”

ভোগ্বল বলল, “আমি একটা কথা বলব ক’বুলি হৈয়ালি। একবাবে গৈঞ্চো ভৃত এরা। না হলে এইরকম ভুল কেউ করে? যেজনে পুলিশও এদের ব্যাপারে মাথা ধামাচ্ছে না। অথবা আমরা মগজ তোলপাড় করে ত্রেনকে কষ্ট দিই কেন? ভদ্রলোককে জানিয়ে দে এইসব ঝামেলায় আমরা নেই।”

বাবলু বলল, “এটা কি একটা কথার কথা হল? মনে রাখিস, আমরা পাণ্ডির গোয়েন্দা। ভদ্রলোক কত আশা নিয়ে ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে। তা ছাড়া অঙ্ককার যত কুটিলই হৈক, তাৰই ভেতৰ থেকে বুজে বের করতে হবে অপরাধীকে। একবাবে না হয় বাবেবাবে চেষ্টা করে। এর মধ্যে শুধু আমাদের নয়, বিলুর বাবারও মর্যাদা জড়িয়ে আছে।”

ভোগ্বল আর কিছু বলল না।

বিলু বলল, “কাল তা হলে কখন যাবি ঠিক করলি?”

“দুপুরে। কেননা কাল রবিবার। কুল খোলা পাব না। সেজনে সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কাল বিকেলে আমরা প্রাথমিক তদন্ত করে পরশু সোমবার ওর ক্ষুলের বাস্তবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই চলে আসব।”

বাচ্চ, বিচ্ছু বলল, “তবে কাল কিন্তু আমাদের একটু অসুবিধে আছে বাবলুদা। আমাদের ছেটামাসি আসবেন কাল।”

বাবলু বলল, “তাতে কী? ওখানে তো আমাদের সকলের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি একাই যাব। বিলু যদি যায় তো সঙ্গে যেতে পারে।”

ভোগ্বল বলল, “ও। আমি যাব না বুঝি?”

“কী করবি গিয়ে?”

“বাঃ। গ্রামটা দেখব। হাওড়া জেলার মধ্যে আমতা, উদয়নারায়ণপুর, ভগুংবল্লভপুর এইসব হচ্ছে নামকরা জায়গা।”

“ঠিক আছে। একটু সকাল করে খাওয়াদাওয়াটা সেৱে নিস তা হলে। ঠিক বেলা বারোটা নাগাদ বেরোব আমরা। তা হলেই দুটোর মধ্যে পৌছে যাব।”

“কতক্ষণ অন্তর বাস, কিছু খবর নিয়েছিস?”

“বাস ওদিকে ঘনঘন। অনেক বাস আছে। উদয়নারায়ণপুর, অটিপুর, রাজবলাহাট, যে-কোনও একটা বাস পেলেই হল।”

পঞ্চ একক্ষণ শুয়ে-শুয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবাব বেশ নাড়াচাড়া দিয়ে শিরদাঁড়া টান করে ওদের পাশে এসে বসল।

বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, “সরি মিং পঞ্চবাবু। তুমি কিন্তু যাচ্ছ না এবাব।”

পঞ্চ ওপর দিকে মুখ তুলে একটা শব্দ করল, “গো-ও-ষ্ট।” অথাৎ সে আবাব কী!

বাবলু বলল, “অবশ্য বাচ্চ, বিচ্ছুও যাচ্ছে না। তাই ওদের জন্যে তোমাকে থাকতে হবে।”

বিছু পঞ্চুর গলা জড়িয়ে বলল, “দেখবি খন, কাল আমাদের বাড়িতে কত ভাল-ভাল রাখা হবে। তোর তো নেমন্তন্ত্র। ভাত খাবি, মাংস খাবি, লুটি খাবি, মিষ্টি খাবি। কত কী খাবি।”

খাওয়ার নামে আদরে গলে গিয়ে বিছুর কোলে মাথা রেখে কুই-কুই করতে লাগল পঞ্চু। ছেট ছেলের মতো পা তুলে দিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি খেয়ে সে কী কাণ্ড !

প্রদিন ঠিক বেলা বারেটা নাগাদ রওনা হল ওরা। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে বাস, মিনি কিডুই পেল না। এক-এক সময় পরিবহণ ব্যবস্থার কী যে হয় কে জানে ! মেজাজ যেন বিগড়ে যায়।

ওরা যখন কীভাবে কী করবে ভাবছে, তেমন সময় এক ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, “তোমরা দেখছি অনেকক্ষণ হেকেই বাসের জন্যে হানটান করছ, তা কোথায় যাবে ভাই তোমরা ?”

“আমরা জগৎবন্ধুভপুর যাব। বাস পাইছি না।”

“তোমাদের কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি। আমারও বাড়ি জগৎবন্ধুভপুর। কাদের বাড়ি যাবে তোমরা ?”

“অধিকা সেনকে চেনেন ?”

“চিনি বইকী ! তোমরা এক কাজ করো, আমতা, মুসিরহাটি, পেড়ো, পানপুর, যে-কোনও বাস ধরে বড়গাছিয়ায় চলে যাও। সেখানে লেভেল ক্রিং স্টেপেজে নামবে। ওখান থেকে হেটে চলে যেয়ো। নয়তো দেনগু রিকশা, ভ্যান যা পাবে ধরে নিয়ো। আর হঠাত যদি কোনও বাস পেয়ে যাও তো খুব ভাল। দু-তিন কিলোমিটারের মতো রাস্তা।”

বাবলু বলল, “আপনিও যাবেন তো ?”

“বাব। তবে আমার একটু দেরি হবে। একজনের আস্তবার কথা আছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছি। তোমরা চলে যাও। ওই দাখো, আমতাৰ একটা বাস ছাড়ছে, সুরক্ষি বাস। যাও, যাও, শিগগিয়ি যাও। বসবার জায়গাত পেয়ে যেতে পারো।”

বাবলু, বিলু, ডোবল তিনজনেই ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল বাসে। ভাগ্য ভাল। পেছনের দিকে একটু বসবারও জায়গা পেয়ে গেল। খুবই

জনতামী বাস। বৰিবার, তাই পথেঘাটেও যানজট কম। হেডেই হুকে করে ছুটতে লাগল। কদমতলা, দশনগৰ, বাঁকড়া, শলপ, মাকড়দহ, তোমঙ্গুড় হয়ে বড়গাছিয়ায় এল প্রায় ষষ্ঠাখানেকের মধ্যে।

ওরা সেভেল ক্রিংয়েই নামল। নেমেই দেখল, বাসের ভাব্য অনেক যত্নী দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে।

বাবলু বলল, “কী করবি রে ? হঠা দিবি ?”

বিলু বলল, “কেমনও আপনি নেই। বেশি দূরের পথ যখন নয়...।”

একজন রিকশাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল, “রিকশা লাগবে নাকি দাদাৰাবু ? যাবেন কোথায় ?”

“জগৎবন্ধুভপুরে।”

“জগৎবন্ধুভপুরের কোনথানে ? শুল, হাসপাতাল, শিবতলা, কালীতলা, কোথায় ?”

“আমরা অধিক সেনের বাড়ি যাব।”

“ভাই বলুন। আপনাদের পুরনো স্টেশনের কাছে নামিয়ে দেব। ওখান থেকে হটেশ্বরতলা হয়ে হেটে চলে যাবেন।”

“পুরনো স্টেশন মানে মাটিন কোম্পানির ? সে তো কবে উঠে গেছে।”

“উঠে যায়নি দাদা। মানুষের হিংসা, লোভ ও প্রতারণার প্রতিবাদে কোম্পানিই উঠিয়ে দিয়েছেন।”

বাবলু বলল, “কত ভাড়া নেবে ?”

“উঠে বসুন তো আগে। তিনঞ্চনে ছ’ টাঙ্কা ভাড়া দেবেন।”

ওরা উঠে বসল। রিকশাও চলতে লাগল। যেতে-যেতেই রিকশাওয়ালা বলতে লাগল, “এই তো কিছুদিন আগে ভদ্রলোকের একটিই মাত্র নেয়ে জলে ডুবে মরা গেল।”

বাবলু বলল, “হ্যাঁ, শুনেছি। খুবই দুঃখজনক।”

“তবে দাদাৰবু, আমাৰ কিন্তু মনে হয় ওটা খুন।”

“সে কী ?”

“তা ছাড়া আবার কী ? সম্পত্তিৰ লোভে আজকাল কী না হয় বাবু ? ওদের নামেটা হচ্ছে মহ শয়তান। এখন তো আবার শুনছি নাকি

মেয়েটা বেঁচে আছে। কোথা থেকে যেন চিঠি লিখছে। এটা কিন্তু ভৃত্যের ব্যাপার। অপঘাতে মৃত্যু হলে মানুষ গয়ায়-টয়ায় যায়। এরা তো সেসব কিছুই করল না।”

“ভৃত্য বলছ খুন ?”

“আমি কেন, সবাই বলছে। যাক, আমেরা বাবু গরিব লোক। আমাদের ইহসব আলোচনা করা ঠিক নয়। ভদ্রলোকের বাবাও তো খুন হয়েছিলেন ওই বাড়িতে।”

বাবলু বলল, “এসব কিছুই জানতাম না তো !”

“সবাই বলে ওটা ভৃত্যের বাড়ি। সক্ষের পর নানারকম উপদ্রব হয়। আপনারা যেন রাত্রিবাস করতে যাবেন না ওখানে। বেলাবেলি ফিরে পড়বেন।”

বাবলু বলল, “হ্যা, তাই ফিরব।”

বিকশাওয়ালা হঠাৎ এক জায়গায় রিকশা থামিয়ে বলল, “এইখানে নেমে যান। বাঁ দিকের পথ ধরে খানিক এগিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে।”

ওরা রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে আমের পথ ধরে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

বাবলু বলল, “এ তো দেখছি রহস্যের পর রহস্য। অধিকাবাবু কিন্তু একবারও বলেননি ওর বাবার খুন হওয়ার কথা।”

ওরা শীত-শ্বেতের পড়স্ত বেলায় সোনা-সোনা ঝোড়ে মেঠো পথ ধরে চলতে লাগল। কোনও এক সময় এই পথে হয়তো মোরাম বিছানা হয়েছিল। তারপর অবহেলায়, অবত্তে ব্যর্থি জল পেয়ে কঙালসার চেহারা হয়েছে পথের। চারদিক এবড়ো-বেবড়ো ডালা পাকানো। এখান দিয়ে রিকশা দূরের কথা একটা সাইকেল গেলেও হোচ্চি থাবে। ওরা ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। খানিক যাওয়ার পরই দেখতে পেল হচ্ছেরের মন্দির। বেশ পরিকার-পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের দরজা বন্ধ। তাই দর্শন করতে পারল না। ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে একটা পথ দেখতে পেল। কয়েকটা ছেলে খেলা করছিল সেখানে। ওরা জিজ্ঞেস করতেই পথ দেখিয়ে দিল তারা। বলল, “যে-পথটা সোজা

গেছে ও-পথে যেয়ো না। ওটা পাতিহালের দিকে চলে গেছে। এই বাঁকা পথটা ধরে যাও, বাড়ি দেখতে পাবে।”

বাবলুরা ডান দিকের বাঁকা পথ ধরেই চলল। এই পথে ডান দিকে, বাঁ দিকে কয়েকটি নতুন-পুরনো বাড়ির পর একপাশে মন্ত একটি সাবেককালের দোতলা বাড়ি দেখতে পেল। বাড়ির নাম ‘নৃসিংহ নিকেতন’। অধিকাবাবু দোতলার বারান্দায় বসে ছিলেন। ওদের দেখেই হ্যাতছানি দিয়ে ডাকলেন, “এসো, এসো।”

ওরা তিনজনে গেটে পেরিয়ে ভেতরে চুকল।

বাহিরেটা যেমন হতারী, ভেতরটা তেমনই সুন্দর। উঠোনে সাতটা মরাই বাঁধা। একপাশে বড় পুরুর। প্রায় বিশে তিন-চার জমি নিয়ে পাঁচিল দিয়ে যেরা।

ওরা একনজরে দেখে নিয়ে ঘরে চুক্তেই একজন মধ্যবয়সী ভারিকি চেহারার সুন্দরী ভদ্রমহিলা ঘরে এসেন। ঠিক যেন দেবী দুর্গা। বললেন, “এসেছ বাবা ! শুনেছ তো সব। এই এত বড় বাড়িতে আমরা দুটি প্রাণী মরে বেঁচে আছি। এইচুক্টুকু ছেলে তোমার। অথচ কত নামডাক তোমাদের। দেশজোড়া যাতি। তা বাবা, একটু চেষ্টা করে দাখো দেখি তোমাদের বোনটিকে খুঁজে বের করতে পারো কি না। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝছি না। চিঠির পর চিঠি আসছে অথচ কোনও ঠিকানা নেই।”

বাবলু বিশ্বাস করে বলল, “চিঠির পর চিঠি !”

“হ্যা ! কাল উনি চলে যাওয়ার পর একসঙ্গে দুটো চিঠি এসেছে। এই দাখো !” বলে টেবিলের ড্রঃয়ার খুলে দুটো খাম বের করে দেখালেন ওদের।

অধিকাবাবু নীরবে এসে দাঁড়ালেন ওদের পাশে।

ওরা এক-একজন এক-একটা চেয়ারে বসে ঝুকে পড়ে দেখতে লাগল সেই চিঠি দুটো। একটি এসেছে বাসালোর থেকে, আর-একটি সিমলা। দুটি চিঠিতেই কোনও ঠিকানা নেই। বাসালোরের চিঠিতে কলকাতার নিউমার্কেট পোস্ট অফিসের ছাপ আছে। সিমলার চিঠিতে মানমাদের।

বাবলু বলল, “আশ্চর্য ব্যাপার ! এ চিঠির অর্থ কী !”

“জানি না বাবা । হয়তো ওর অতুল্প আঘাই এই চিঠি লিখছে ওপার থেকে ।”

বাবলু দুটো চিঠিই পড়ে দেখল ।

একটিতে লেখা আছে, “মা ! আমার জন্যে চিন্তা কোরো না । আমি কিন্তু মরশের পরে খুবই সুখে আছি । বাইরের দেশের জলহাওয়ায় আমার চেহারা খুব ভাল হয়েছে । একবার বাপিকে নিয়ে বাস্তালোরে এসো না ? দেখা হবে ।” অপরটিতে লেখা আছে, “সত্তি, কতদিন যে দেখিনি তোমাদের ! সিমলার ম্যালে বসে এই চিঠি লিখছি । এখন যেন আসতে যেয়ো না এখানে । কী দুরুণ শীত ! রোজ বরফ পড়ে । এক-এক সময় মনে হয়, আর নয়, এবার ফিরে যাই । কিন্তু ফিরে যাওয়ার কথা মনে পড়লেই চোখে ভল আসে । নিজের মেয়েকে যারা চিনতে ভুল করে তারা কি... ?”

বাবলুর হাত থেকে খসে পড়ল চিঠিটা । ও স্তক হয়ে গেল ।

বিলু, ভোঁসলের মুখেও কথা নেই ।

বাবলু বলল, “এই রহস্যের সমাধান করতে গেলে আমরাই হয়তো পাগল হয়ে যাব ।”

অধিকাবাবু বললেন, “আমাদের অবস্থাটা তা হলে কী, এবার বুরতে পারছ তো ? পুলিশ এই বাপারে একদম গুরুত দিচ্ছে না । এখন তোমরাই আমাদের বল-ভরসা ।”

“সবই বুবানাম । কিন্তু আমরাই বা কোন সূত ধরে এগোব বলুন তো ? আপনারা নিজেরাই যেখানে সুস্থ মন্তিকে আপনাদের মেয়ের সংরক্ষণ করে এসেছেন, সেখানে এই চিঠির মূল্য কতটুকু ?

এখন সময় একজন বৃক্ত কাজের লোক তিনটি প্লেটে কয়েকটা করে রসগোল্লা এনে ওদের সামনে ধরে দিল ।

অধিকাবাবু বললেন, “এই হল ভজহরি । আমার বাবার আমলের লোক । বাবা খুব ভালবাসতেন ওকে । অত্যন্ত বিশ্বাসী । তাই পূরনো লোকজন সবাই বিদায় নিলেও ওকে আমরা ধরে রেখেছি ।”

ভজহরি বলল, “থোকাবাবুরা রাত্রে ভাত না খাচি থাবেন ?”

বাবলু বলল, “যা হোক ।”

ভজহরি চলে গেল ।

বাবলু বলল, “আপনার মেয়ের হাতের লেখা দেখেছি । তবু আর-একবার ভাল করে দেখব । অমনই ওর ফোটো কীরকম কী আছে একটু দেখাবেন তো !”

“আগে তোমরা এগুলো খেয়ে নাও । তারপরে এক-এক করে সব দেখাব । ওপরের ঘরে চলো । ওর পড়বার ঘরে । সেখানেই সব কিছু গুচ্ছে রাখা আছে ।”

বাবলু খেতে-খেতেই বলল, “মেয়ে কি বাত্তিবেলা ওপরের ঘরে শুভ ?”

“না-না । ও নীচে আমাদের কাছেই থাকত । আমরা ওকে কাছছাড়া করতাম না ।”

খাওয়া হলে দোতলায় উঠল ওরা । দোতলার বারান্দা থেকেই চারদিকের অক্তির শোভা-সৌন্দর্য দেখে মুক্ত হয়ে গেল । চমৎকার গ্রাম ।

বাবলু বলল, “নদীটা এখান থেকে কত দূর ?”

“একটু দূরে আছে । আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব তোমাদের ।”

বাবলুরা শুপরে উঠেই যে-যদে চুকল সেই ঘরটাই সংযুক্ত পড়বার ঘর । দেওয়ালে ফুটফুটে এক কিশোরীর প্রাণবন্ত রঙিন ছবি বৌধানো হিল । ওরা সেদিকে তাকাতেই অধিকাবাবু বললেন, “আমার মেয়ের ছবি এটা ।”

বাবলু বলল, “কী সুন্দর মুখ । ঠিক ওর মায়ের মতো ।”

অধিকাবাবু একটা দীর্ঘাস ফেলে বললেন, “আরও ছবি দেখবে ? এই দ্যাখো ।” বলে একটা অ্যালবাম মেলে ধরলেন ওদের দিকে । সবই পারিবারিক ছবি । কোনওটি সন্ট লেকের বাড়ি । কোনওটি এখানের । এ ছাড়া, চিড়িয়াখানা, ভিস্টোরিয়া, স্কুল, নদীর ধার, সব জায়গাকার ছবি আছে । এক বৃক্ষদীপ্তি কিশোরীর প্রাণচারণ্যে ভরা কুসুম ফোটার ছবি ।

এর পরে অধিকাবাবু মেয়ের স্কুলের খাতা, গানের খাতা এনে বললেন, “এই দ্যাখো, ওর হাতের লেখা ।”

মেয়েটির হাতের লেখা বাবলু তো আগেই নেথেছিল। তবু আরও একবার দেখল খুঁটিয়ে। অবাক বিশ্ময়ে লক্ষ করল, সত্যি-সত্যিই দুটি লেখাই এক।

বিলু, ভোগল কারও মুখেই আর কথা নেই।

বাবলু অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগে মেয়েটির বই খাতাগত্র—সবই উলটোপালটে দেখতে লাগল।

অধিকাবাবু বিলু ও ভোগলকে নিয়ে ওপরের ছাদে উঠলেন।

সব কিছু দেখতে-দেখতে ইঠাই একটি ভাঁজ করা চিঠির দিকে নজর দিল বাবলু। সে-চিঠিটা একবার-দু'বার নয়, বারবার পড়ল। পড়ে, সেটা পকেটে ঢুকিয়ে ওর মনোমতো মেয়েটির দু-একটি ছবি আলাদাম থেকে খুলে কাছে রাখল। তারপর সেও উঠে এল ওপরের ছাদে।

অধিকাবাবু বললেন, “দেখলে সব কিছু ?”

“হাঁ, যা-যা দেখবার দেখলাম।”

“এবার তা হলে নীচে চলো।”

ওরা সবাই নীচে নেমে এল। অধিকাবাবুর স্তৰি তখনও সেই একইভাবে নীচের ঘরে বসে ছিলেন। বাবলু তাঁর কাছে গিয়ে বলল, “আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজেস করি, ঠিক-ঠিক উভর দেবেন কিন্তু।”

ভদ্রমহিলা বললেন, “কী কথা, বলো ?”

“আপনার মেয়ে যেরেকম সুন্দরী, ওরা যাক সে এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সেই মেয়েটিও কি ঠিক একই রকম ছিল ?”

ভদ্রমহিলা চাঁথের জল মুছে বললেন, “তা তো বলতে পারব না বাবা। ও যেদিন হারিয়ে গেল, সেদিন থেকে আমাদের দু'জনের মাথার ঠিক ছিল না। আর যেদিন ওর মৃতদেহ উদ্ধার করা হল, সেদিন খবরটা শোনার পর থেকেই জ্ঞান ছিল না আমাদের।”

“সর্বনাশ। তা হলে আপনারা কী করে জানলেন যে, ওই বেওয়ারিশ লাশটাই আপনাদের মেয়ের ?”

“ওর জুতো, কমাল, বিস্টওয়াচ, এইগুলোই যে প্রয়াগ বাবা।”

বাবলুর শিরদীঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা শ্রোত নেমে এল। বলল,

২২

“ডেডবড়ির কাছে কারা-কারা ছিল ?”

“অনেকেই। নায়েবকাকা, ভজহরি, সবাই ছিল।”

বাবলু বলল, “আপনারা নির্যাতি কোনও একটা অশুভ চত্রের শিকার হয়েছেন। আপনাদের পরিবারকে যিনে যে কালো মেঘের দল ঘনীভূত হয়েছে তা সর্বাত্মে দূর করতে না পারলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।”

অধিকাবাবু বিশ্বিত হয়ে বললেন, “কী বলছ বাবা তুমি ? কালো মেঘের দল ?”

“হাঁ। এর বেশি এখনই কিছু বলা যাবে না। আচ্ছা, আর দেরি করে লাভ নেই। চলুন, বেলা থাকতে-থাকতে নদীটা একটু দেখে আসি। আর সেইসঙ্গে পিকনিক স্পটটাও একটু দেখাবেন।”

অধিকাবাবু বললেন, “চলো।” বলে ওদের নিয়ে গ্রাম্য পথ ধরে যেতে-যেতে একসময় একটি পূরনো মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, “এই হল শিবতলা। আর এই যে মন্দির দেখছ এর মতো অপূর্ব টেরাকেটার কাজ এই অঞ্চলে একমাত্র আঠিপুর ছাড়া কোথাও নেই।”

সকলে মন্দির দেখে আরও এগোতে লাগল। খানিক বাওয়ার পরই দেখা মিলল নদীর। কানা নদী। কোনওরকম সৌন্দর্য নেই। একে একটা পচা খাল ছাড়া কিছুই বলা যায় না। তবু ওরই মধ্যে একটি জ্যায়গা বেশ পরিকার-পরিষ্কৃত।

অধিকাবাবু বললেন, “আমার মেয়ে এইখানেই পিকনিক করছিল। ওই দাখো শোভারানি কলেজ। আরও খানিক এগোলে মেয়ের স্কুল।”

তারপর একটা কংক্রিটের সেতু দেখিয়ে বললেন, “ওপারে এখনকার হাসপাতাল আর বিখ্যাত খায়েদের বাড়ি।”

সকলে পর্যন্ত নদীর ধারে ঘুরে ওরা আবার বাড়ি কিনে এল।

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর অধিকাবাবু বললেন, “তোমাদের ওপরের ঘরেই শোওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের পেস্টো এলে ওপরের ঘরেই থাকেন।”

বাবলু বলল, “আমাদের জনো যেখানে খুশি ব্যবস্থা করতে পারেন। আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।” তারপর বলল, “আচ্ছা, আপনার বাবা কী কারণে খুন হয়েছিলেন ?”

২৩

চমকে উঠলেন অধিকাবাৰু, “খুন হয়েছিলেন ! কে বললে ?”  
“আপনি বলেননি। তবে যেভাবেই হোক, খবৰটা আমৰা  
জেনেছি।”

“মিথ্যে কথা। যে বলেছে সে মিথ্যে কথা বলেছে।”

“সত্যি কথাটা তা হলে আপনাৰ মুখ থেকেই শুনি। গোপন কৰলে  
কিন্তু আপনাৰ মেয়েও রহস্যৰ অক্কারে থেকে যাবে। আপনি ও বিপদে  
পড়বেন।”

অধিকাবাৰু হিৰ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বাবলুৰ মুখেৰ দিকে।

বাবলু বলল, “আৱ-একটা কথা। মৈনাক চৌধুৰী কে ?”

অধিকাবাৰু যত না চমকালেন, বিলু, ভোধল তাৰ চেয়েও বেশি  
চমকাল। মৈনাক চৌধুৰী আবাৰ কে বে বাবা ! এ নাম বাবলু পেল  
শোখায় ?”

অধিকাবাৰু বললেন, “মৈনাক চৌধুৰীৰ নাম তুমি জানলে কী কৰে ?”

বাবলু বলল, “আমি আপনাকে প্ৰশ্ন কৰব। আপনি কিন্তু আমাকে  
কৰবেন না। যাক, যাত হয়েছে। এবাৰ শুয়ে পড়া যাক। ভজহৰিকে  
বলুন, যাতে খাওয়াৰ মতো একটু জল দিয়ে যেতে।”

কাৰও মুখে কথা নেই। সকলে নিঃশব্দে ধীৰ পায়ে সিঁড়ি বেঞ্চে  
ওপৱে উঠতে লাগল।

### ॥ ৩ ॥

ঘৰে বিছানায় শুয়ে তিনজনেই চুপ কৰে বইল কিছুক্ষণ। দুশ্চিন্তায়  
যুম আসছে না।

একসময় বিলু বলল, “মৈনাক চৌধুৰী কে বে বাবলু ?”

“পৰে বলব। এখন ওই সংক্রান্ত কোনও আলোচনা নয়। জেনে  
যাবিস, বাতাসেৰও কান আছে।”

ভোধল বলল, “দ্যাখ বাবলু, সকাল হনেই আমৰা কেটে পড়ি চল।  
দৰকাৰ নেই এইসব বামেলায়। আমৰা মন কিন্তু একদম সাহ দিচ্ছে  
না।”

বাবলু বলল, “এই কথা আমিও যে ভাবছি না তা নয়, তবে মেয়েটাৰ  
২৪

ছবি দেৰে মনটা যেন কীৰকম হয়ে গেছে। তাই যেভাবেই হোক ওকে  
উক্কার আমৰা কৰবই।”

“তোৱ কি মনে হয় সত্যিই ও বেঁচে আছে ?”

“হ্যাঁ। যে-কোনও কাৰণেই হোক, কেউ তাকে গুম কৰে রেখেছে  
এবং হয়তো তাৰ ইচ্ছেৰ বিৰুদ্ধেই তাকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছে  
এইভাৱে।”

“সত্যি, তোৱ দূৰদৃষ্টি আছে রে !”

এইভাৱে কথা বলতে-বলতেই অনেক রাত হয়ে গেল। বিলু, ভোধল  
যুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। বাইৱে নারকোলগাছেৰ পাতায় বসে একটা  
পাঁচ ডাকল। হঠাৎ মনে হল কে যেন চাটি পায়ে ফটাস-ফটাস শব্দ  
কৰে একবাৰ ওদেৱ জানলাৰ কাছে আসছে, আৱ চলে যাচ্ছে। বাবলু  
কনুইয়েৰ গুঁতো দিয়ে বিলু ও ভোধলকে একটু সজাগ কৰে টুচ্ছা হাতে  
নিয়ে যেই না উঠতে যাবে, অমনই দেখতে পেল জানলাৰ গৱাদেৱ কাছে  
একটা অতিকায় মুখ ওদেৱ দিকে হিৰ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে কী  
বীভৎস মুখ ! যেন আকাশ থেকে বসে পড়া একটা উৰ্কাপিণ্ড ছাড়া কিছু  
নয়। কী ভয়ঙ্কৰ ! বাবলু সেই মুখেৰ ওপৱ উচ্চ ফেলতেই অদৃশ্য হয়ে  
গেল মুখটা।

ওৱা লাফিয়ে জানলাৰ কাছে এসে দেখবাৰ চেষ্টা কৱল কোথায় গেল  
সে। কিন্তু না। কেউ কোথাও নেই।

বাবলু দৰজাৰ যিল খুলে দৰজাটা টেনেই বুধাল ওটা বাহিৱেৰ দিক  
থেকে শিকল দেওয়া। ওৱা চিৎকাৱ কৰে ডাকতে লাগল  
অধিকাবাৰুকে। ভজহৰিৰ নাম ধৰেও ডাকল।

একসময় সবাই এসে দৰজা খুলে বললেন, “কী হয়েছে বাবা !  
চেচামেটি কৰছ কেন ?”

“তাৰ আগে বলুন, বাহিৱেৰ দৰজায় শিকল দিয়েছিল কে ?”

অধিকাবাৰু বললেন, “বিশ্বাস কৱো, আমৰা দিইনি।”

ভজহৰি বলল, “আমি দিইনি দাদাৰাবু। আপনাৰা আমাদেৱ  
অতিথি। আপনাদেৱ ঘৰে কথনও শিকল দিতে পাৱি ? আমি তো খাবাৰ  
জলটুকু পৌছে দিয়েই নীচে নেমে গোলাম।”

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল অধিকাবাবুকে ।

অধিকাবাবুর স্ত্রীর ফিটের অসুখ । তাই শোনামাত্রই জ্ঞান হারালেন ।

অধিকাবাবু বললেন, “আমার বাবা মৃত্যুর আগে পর-পর তিনদিন ওই মুখ দেখেছিলেন । আমার মেরোও হারিয়ে যাওয়ার আগে একদিন সক্ষেরাতে দেখেছিল ওই মুখ । ওই মুখ যে দেখবে তার একটা-না-একটা বিপদ হবেই ।”

বাবলু বলল, “সকাল হতে এখনও অনেক দেরি । আপনারা নীচে যান । আমরা সতর্ক আছি ।”

অধিকাবাবু সকলের সাহায্য নিয়ে ধরাধরি করে স্ত্রীকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন নীচে ।

বাবলুরা আবার ওপরে এসে দরজায় থিল দিল । তবে সে রাতে আর ঘুম হল না কারণও ।

পরদিন সকালে ঘরের মেরোয়ে একটা দলা পাকানো কাগজ পড়ে থাকতে দেখে বাবলু কৃতিয়ে নিল সেটা । তারপর সেটা পড়ে দেখতেই রাগে কান দুটো লাল হয়ে উঠল । তাতে লেখা ছিল, ‘ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও । এখানকার মাটিতে পা রেখো না । বিপদে পড়বে ।’ কাগজটা ভাঁজ করে মুড়ে পকেটে রেখে বিলু ও ভোগলকে নিয়ে নীচে নামল বাবলু ।

অধিকাবাবু বললেন, “কাল রাতের ওই ঘটনার জন্যে আমরা সত্তিই দুঃখিত । শুধু তাই নয়, বেশ ভয়ে-ভয়েও আছি আমরা । এখন তোমরা চাঁটা খাও । আমার মেয়ের দু-একজন বন্ধুকে ডাকি, তাদের সঙ্গে কথা বলো । তারপর... ।”

বাবলু বলল, “তারপর আমরা বাড়ি ফিরে যাব ।”

“দুপুরের খাওয়াদাওয়াটা এখানে করে গেলে হত না ?”

“কোনও প্রয়োজন নেই । একটা কথা বলে রাখি, আপনার মেয়ের অপহরণকারীরা কিন্তু আশপাশেই আছে । হয়তো আপনি তাদের টাগেটি ।”

“কাল রাতের ওই ভয়ঝরই তো সেই কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে ।”

বাবলু বলল, “আছা, আপনাদের নায়েবমশাইয়ের সঙ্গে কি একবার দেখা করা যায় না ?”

“ওকে আমি খবর দিয়েছি । তবে আসবেন কি না জানি না । ভীরুণ একঙ্গয়ে লোক । তা ছাড়া ওর সঙ্গে আর এখন আমার আগের সেই সন্ত্বাবটা নেই । তবে একেবারে যে কথাবার্তা নেই তাও নয় । মাবেমধ্যে এখানে এলে বৈষ্যিক ব্যাপারে টুকটাক দু-একটা কথা বলেই চলে যান ।”

“আছা, আপনার ভাই নাসিকে কতদিন আছেন ?”

“দু-তিন বছর । মেখানে ওর চেম্বার, নার্সিং হোম । দারণ ব্যাপার ।”

“আপনাদের এই সম্পত্তির কতটা অংশ তাঁর ?”

“এই সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশটাই বাবা আমার মেয়ে সংযুক্তার নামে উইল করে দিয়ে গেছেন । আমাদের দু’ ভাইয়ের কাউকেই দেননি ।”

“আপনার ছেট ভাই না হয় লক্ষ-লক্ষ টাকার মালিক । কিন্তু আপনাকে তিনি বঞ্চিত করলেন কেন ?”

“সেটা ওই কুচকুচি নায়েবের পরামর্শে । তবে মেয়ের সম্পত্তি তো আমারই ।”

“মেয়ে বড় না হওয়া পর্যন্ত । তারপর ? বিয়ে তো দিতে হবে মেয়ের । জামাই যদি সেরকম না হয় ?”

অধিকাবাবু বললেন, “সে যা হয় হবে ।”

“আপনাদের সম্পত্তির পরিমাণ কত ?”

“অনেক । স্বনামে, বেনামে প্রচুর জমিজমা ছিল । সব এখন ওই মেয়ের নামে । বড়গেছে, মুসিরাহাট, পাতিহাল, উদয়নারায়ণপুর, এমনকী চাঁপাড়াঙা, শিয়াখালাতেও জমি আছে । এককালে আমরা এখানকার জমিদার ছিলাম ।”

এমন সময় একজন কৃক্ষবর্ণের দীর্ঘকায় ভদ্রলোক খড়ম খটখটিয়ে সেখানে এলেন, “কার সঙ্গে এত বকবক করছ সকালবেলায় ?”

অধিকাবাবুর স্ত্রী একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন, “বসুন ।”

অধিকাবাবু বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “নায়েব কাকা ।”

অত্যন্ত রশ্বভাবী প্রকৃতির লাল-লাল পায়রা-চোখো নায়েবমশাই ওদের দিকে আড়চোখে তাকালেন। চেহারা দেখেই বাবলুর মনে হল সাঙ্গাং শয়তানের অবতার ছাড়া কিছুই নয় লোকটা।

অধিকাবাবু বললেন, “এই এদের জন্মেই ডাকলাম আপনাকে। পাওব গোয়েন্দা।”

নায়েবমশাই একটু বিরক্তির সুরে বললেন, “তোমারও যেমন মাথা খারাপ। শোনো বাপু, ওসব গোয়েন্দা-টোয়েন্দা দিয়ে কিছু হবে না। আর এসব ছেলে-ছেকরার কাজ নয়। যে গেছে সে গেছে। তার আশা হেতে দাও। আমরা এত লোক দাঁড়িয়ে থেকে যার সংকার করলুম, সে আবার চিঠি লেখে কোথেকে শুনি?”

বাবলু বলল, “তা হলে এই যে চিঠিগুলো আসছে এগুলো কি ফলস?

“অবশ্যই। এ-নিয়ে একদম মাথা ঘামিয়ো না। হাতের নেখ নকল করবার লোকের অভাব নেই। আজকাল আঠিস্ট কি কম আছে? কেউ নিশ্চয়ই রসিকতা করছে ওভাবে চিঠি পাঠিয়ে।”

বাবলু বলল, “এ তা হলে সাজ্জাতিক রসিকতা। না হলে কোথায় নাগপুর, কোথায় মানমাদ। এইসব জায়গায় নিয়ে চিঠি পোস্ট করে আসা নেহাত কৰ্ণাহা হাতের কাজ নয়। তা ছাড়া কে কোন স্বার্থে এই কাজ করছে সেটাও তো একবার জানা দরকার।”

নায়েবমশাই বললেন, “শোনো হে ছোকরা, বেশি পাকামি কোরো না। এতই যদি গোয়েন্দাগিরি করবার শখ তো যাও না, দেশের এত রথী-মহারথীরা খুন হচ্ছেন, সেইখানে নিয়ে তদন্ত করো। দেখব মুরোদ কত। এক-এক করে সব ধরিয়ে দাও দেবি! এখানে এসেছ কেন শস্তা বাধ্যদুরি নিতে?”

বাবলু হেসে বলল, “আমরা ও জানি দেশের এখন সমস্যা অনেক। তবে কী জানেন, সমুদ্রে জাহাজও ভাসে আবার জেলে-ডিঙিও। আমরা হচ্ছি সেই জেলে-ডিঙি। আমাদের বহন-শক্তা যে অনেক কম। তাই যতদিন না বড় হই, ততদিন এই ছেটু তরিটিতে জাহাজের জিনিসপত্র বোঝাই করে বীৰ কৰব থ ভৱাভুবি হয়ে যাবে যে? অতএব বিদ্যুপ নয়, আপনার আশীর্বদি এবং সহযোগিতাটুন্মুক্ত আমরা প্রার্থনা করি।”

শান্ত হওয়া দূরের কথা, আরও ছালে উঠলেন নায়েবমশাই, “দ্যাখো, এইসব পাকা ছেলের মতো বুলি কপচিয়ে কোনও লাভ হবে না। তোমাদের দোড় আমার জানা আছে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে যাও দেখি?”

বাবলু বলল, “আপনার নামটা জানতে পারি কি?”

“তোমার সাহস তো কম নয়। আমি তোমার দাদুর বয়সী লোক, তুমি আমার নাম জানতে চাইছ? আমার নাম কঢ়কিশোর চৌধুরী। সবাই আমায় ‘নায়েব চৌধুরী’ বলে। আর কিছু জানতে চাও?”

“না। আপনার সহযোগিতা দূরের কথা, আমাদের মনে হয় আপনার কাছ থেকে সামান্য একটু ভদ্রতা বা সৌজন্য আশা করা যাব।”

নায়েব চৌধুরী রাগত-স্বরে অধিকাবাবুকে বললেন, “তুমি বাপু দয়া করে অথবা আমাকে এইভাবে ডাকিয়ে এনো না। পুলিশ আসে, জেরা করে, মুখ খুলব। না হলে নাতির বয়সী এইসব ছেলের কাছে জবাবদিহি করতে আমি রাজি নই।”

বাবলু অধিকাবাবুকে বলল, “আপনার ভাইয়ের নাসিকের ঠিকানাটা আমাদের একটু দেবেন?”

“ওর ঠিকানা তো আমার জানা নেই বাবা।”

“আচ্ছা। আমরা তা হলে আসি?”

অধিকাবাবু বললেন, “আসবে? ঠিক আছে, আমার ভাইয়ের ঠিকানা আমি পরে তোমাদের পাঠিয়ে দেব।”

বাবলু বলল, “কোনও দরকার নেই। এইসব কেসে আপনারা পুলিশের কাছেই যান। সেটাই ঠিক হবে।”

নায়েব চৌধুরী হঠাতে কী যেন ভেবে বললেন, “দাঁড়াও।” বলে পাশের একটি ঘরের তালা খুলে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, “এবার বিদেয় হও। এইসব বুট-ঝামেলায় না থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া করো, ভীবনে উন্নতি করবে।”

বাবলু বলল, “আপনার উপদেশটা মনে রাখবার চেষ্টা করব। তবে সংযুক্তাকে ফিরিয়ে আমরা আনবাই। আর চেষ্টা করব মৈনাক চৌধুরীর হাতেও হাতকড়া পরাতে।”

সাপের মতো ফৌস করে উঠলেন নায়ের চোমুণ্ডা, “কান সন্ধেকে কী  
বলছ তুমি জানো ? মৈনাক আমার ছেলে।”

“এবং সে একজন মেডিকেল বিপ্রেফেনেন্টিভ, আর স্প্রিংডি থেকে  
বাস্তিত আনন্দমোহন হলেন অধিকাবাসুর বৈমাত্রে ভাই। অতএব সন্দেহ  
কিন্তু একটা থেকেই যায়।”

বিনা মেঘে যেন বজায়াত হল।

বাবলু, বিলু, ভেপ্পল একটিও কথা না বলে বেরিয়ে পড়ল নিশিংহ  
নিকেতন থেকে। তারপর সোজা হাই পুলের দিকে এগিয়ে চলল।

প্রথমেই একটা দোকানে বসে একটু জলযোগ সেতে নিল শুরা।  
তারপর কিছুক্ষণ নদীর ধারে ঘুরে সময় কাটাল। পরে কয়েকজন  
মেয়েকে পুলের দিকে যেতে দেখে বাবলু এগিয়ে গিয়ে বলল, “এই যে  
বেনেরো ! একটা ব্যাপারে তোমাদের এই ভাইটিকে একটু সাহায্য করবে  
তোমরা ?”

দুটি মেয়ে আড়তোথে তাকিয়ে কিক করে হাসল। বলল, “বলো, কী  
সাহায্য চাও ?”

বাবলু বলল, “যদি অন্য কিছু মনে না করো তা হলে...।”

“ভনিতা না করে বলেই ফ্যালো।”

“এই পুলে সংযুক্ত নামে কোনও মেয়ে পড়ত ?”

মেয়ে দুটি থামকে দাঁড়াল এবার। তারপর একবার বাবলুর  
আপাদমস্তক দেখে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, “একটু  
দাঁড়াও। কেয়া যদি এসে থাকে ওকে ডেকে দিছি। সংযুক্তাব ব্যাপারে  
ওই ভাল বলতে পারবে।”

“আমরা তা হলে অপেক্ষা করছি।”

মেয়ে দুটি চলে গেল।

একটু পরে শ্যামলা একটি মেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, “কে  
আমাকে ডাকছে ভাই ?”

বাবলু বলল, “আমরা। সংযুক্তাব ব্যাপারে তোমার মুখ থেকে কিছু  
শুনতে চাই।”

“তোমরা ?”

“আমরা ওর দূর সম্পর্কের ভাই।”

“বিশ্বাস করলাম না। কেননা আমি জানি ওর কোনও ভাই-টাই  
নেই। তা ছাড়া আমার এখন ক্লাস আরম্ভ হবে। তোমরা বরং বিকেলের  
দিকে, মানে আমার ছুটির পর এসো, তখন কথা বলব।”

বাবলু করণভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, “একদিন যদি স্কুল না  
করো, কোনও ফুটি হবে তোমার ?”

“কিন্তু আমি তো চিনি না তোমাদের।”

বাবলু বলল, “চেনবার দরকারও নেই। মনে যদি এতটুকু দ্বিধা থাকে,  
তা হলে চলো, আমরা বরং তোমার বাড়িতে যাই। সেইখানে তোমার  
মা-বাবা থাকবেন। তাঁদের সামনেই যা জানবার জন্মে নেবে।”

কেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে  
তুমি অত্যন্ত ভাল ছেলে। তোমরা এই তিনজন, না ?”

“আপাতত।”

কেয়া এবার বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার কী মনে  
হয় জানো ? কোথাও যেন একটু ভুল হয়ে গেছে। সংযুক্ত মরেনি।  
সবই চক্রান্ত।”

“হঠাৎ তোমার এইরকম মনে হওয়ার কারণ ?”

“সব তোমাদের বলব।”

“আমাদেরও তাই মনে হয়। আর সেইজন্যেই আমরা ওকে উদ্ধার  
করবার চেষ্টা করছি। তুমি যদি তোমার বাবুবীকে ভালবেসে থাকো তা  
হলে ওর সন্ধেকে যা-যা জানো সব বলবে।”

“তোমরা তা হলে দাঁড়াও। আমি চট করে আমার বইগুলো নিয়ে  
আসি।” বলে ছুট্টে ক্লাসে চুকে ওর বইগুলো নিয়ে এল। তারপর বলল,  
“আমার বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। একটু দূরেই কোথাও যাই  
চলো। কোথায় যাবে ?”

“আমরা তো এখানকার কোনও কিছুই চিনি না। তুমি যেখানে নিয়ে  
যাবে সেখানেই যাব।”

ভাগ্যক্রমে একটা খালি টাক্কি তখন এসে পড়েছিল সেইখানে। কেয়া  
বলল, “হাত দেখিয়ে ওটাকে থামাও।”

টাক্কি থামতেই ওরা উঠে বসল ভেতরে ।

ড্রাইভার জিজেস কলল, “কোথায় যাবে ভাই ?”

কেয়া বলল, “বড়গাছিয়া রেল স্টেশনটা খুব ফাঁকা । সেইখানেই চলো ।”

টাক্কি কড়ের বেগে ছুটে চলল স্টেশনের দিকে ।

ওরা যখন টাক্কিতে উঠছিল তখন হঠাৎই বাবলুর চোখে পড়ল রাস্তার ওপারে একটা মুদির দোকানে দাঢ়িয়ে কোনও কিছু কেনবাবর অছিলায় নায়েব কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী সাপের চোখে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে ।

॥ ৪ ॥

বড়গাছিয়া স্টেশনটা একেবারেই ফাঁকা জায়গায় । সারাদিনে ট্রেনও যায় একটি-দুটি । তাই খুব নির্জন । সেই নির্জন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের ওভারব্রিজের সিডিতে বসে কথা বলছিল ওরা ।

বাবলু বলল, “দ্যাখো কেয়া, তোমাকে সত্যি কথাই বলি । সংযুক্ত আমাদের বোন-টোন কেউ নয় । তবু আমরা ওর এই বিপদে এগিয়ে এসেছি । তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ওর দু-একটা চিঠি ওদের বাড়িতে এসেছে ।”

“শুনেছি । আর ঠিক তখনই আমার মনে হয়েছে ও বেঁচে আছে এবং এইসব হচ্ছে চৰাস্ত ।”

“তুমি কি সেইরকম কোনও আভাস পেয়েছিলে ?”

কেয়া ঘাড় নাড়ল । বলল, “আগে তোমাদের পরিচয়টা দাও । তোমরা কে, কীভাবে এবং কোথা থেকে এখানে এলে, তোমাদের নাম কী ? বলো ? আমিও বলব ।”

বাবলু বলল, “আমাদের পরিচয় ? আমার নাম বাবলু । ওর নাম বিলু । আর এই যে বসে আছে, এর নাম...”

কেয়া চোখ দুটো বড়-বড় করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, “ভোক্সল । আর পরিচয় দিতে লাগবে না । আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি পাওব গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা বলছি । সত্যি কত গর্জ যে শুনেছি

তোমাদের । তা বাচু, বিছু কই ? পঢ়ু কোথায় ?”

বাবলু হেসে বলল, “সময়ে সবাই আসবে ।”

কেয়া বলল, “যাক । আমিও এবাবর আশাৰ আলো দেখতে পাচ্ছি । আমাৰ মন বলছে সংযুক্তাকে আবাৰ ফিরে পাৰ ।”

“আমাদেৰ হাতে সময় খুব অল্প । চটপট ওৱ সময়কে যা জানো বলে ফালো । এখনই ফিল্ডে নেমে পড়তে হবে আমাদেৰ । না হলে গতি আবাৰ কোন দিকে ঘুৰে যাবে কে জানে ?”

কেয়া বলল, “সেদিনেৰ ঘটনা দিয়েই শুরু কৰি তা হলৈ ?”

“হাঁ । তাই কৰো ।”

কেয়া বলতে লাগল, “পিকনিকটা আমাদেৰ হঠাৎই হয়েছিল । তাই কাছাকাছিৰ মধ্যে আমৰা নদীৰ ধাৰটাই বেছে নিয়েছিলাম । আমৰা খুব দেৰিতে শুৱ কৰেছিলাম বলে রাজা হতেই দুপুৰ গড়িয়ে গেল । এই সময় হঠাৎ কেমন যেন একটু ভাবাস্তৱ লক্ষ কৰলাম সংযুক্তার মুখে । আমাৰ মনে হল ও যে-কোনও কাৰণেই হোক, খুব ভয় পেয়েছে । ওকে যত জিজেস কৰলাম, ‘তোৱ কী হয়েছে ?’ ও কিছুই বলল না । একসময় বলল, ‘তোৱা থাক । আমি চট কৰে একবাৰ বাড়ি থেকে আসছি । বাবাকে আমাৰ ভীষণ দৰকাৰ ।’ সেই যে গেল ও, আৱ ফিৰল না । দেৱি দেখে আমৰা ওৱ বাড়িতে গেলাম । ওৱ বাবা-মা তো শুনেছি আবাক । বললেন, ‘কই ! আসেনি তো মেয়েটা ।’ তাৰপৰই শুৱ হল খৌজাখুজি । সবাই মিলে চারদিক তোলপাড় কৰে ফেললাম । ওৱ বাবা থানা-পুলিশ কৰলৈন । কিঞ্চি কেউ কোনও হদিসই পেল না ওৱ ।”

“আছা, ও কথনও কোথাও পালিয়ে যাওয়াৰ কথা ভাবত ?”

“না । কেনই বা পালাবে ? কোন দুঃখে পালাবে ? আমি ওৱ সব জানি । ও আমাৰ কাছে কোনও কিছু লুকোত না । তবে একটা কথা ও প্রায়ই বলত, ‘দ্যাখ কেয়া, আমাৰ কিঞ্চি খুব ভয় কৰে । সণ্টলেকেৰ বাড়ি ছেড়ে বাপি কেন যে এই গ্রামে এসে পড়ে আছেন তা বুঝি না । সম্পত্তি আৱ টাকা ছাড়া বাপি কিছু বোৱেন না । আমাৰ কেবলই মনে হয় কেউ একদিন আমাকে চুৰি কৰে নিয়ে যাবে ।’

“কেন, এৱকম মনে হত কেন ?”

“তা জানি না । তবে ওকে জিজ্ঞেস করলে ও বলত, ‘দেখিস, আমার কথা মিথ্যে হবে না ।’ আসলে ওদের পারিবারিক ঝামেলটা তো খুব । প্রচুর সম্পত্তি ওদের । ওর ঠাকুরদার দুটো বিয়ে । প্রথম পক্ষের ছেলে সংযুক্তার বাবা । দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে তাঃ আনন্দমোহন । উনি বরাবরই দেশের বাইরে থাকতেন । এখন নাসিকে আছেন । সংযুক্তার বাবা বাবসা করতেন কলকাতায় । কিসের ব্যবসা তা অবশ্য জানি না । তবে যে-কোনও কারণেই হোক, সব ছেড়েছুড়ে উনি দেশে চলে আসেন । হতিমধ্যে ওদের বাড়িতে যে নায়েবকাকা থাকতেন, তিনি ওদের সম্পত্তি দেখাশোনা করতে গিয়ে প্রচুর টাকা আহসান করেছেন । তাই সেইসব ধরা পড়ে যাওয়ার সংযুক্তার বাবা নায়েবকাকাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন বাড়ি থেকে । উনি কাছাকাছি খুর পৈত্রিক বাড়িতে উঠে যান । ওরও কিছু জমিজমা আছে । তা ছাড়া নায়েবকাকার ছেলেও আছে একটি ।”

“জানি । তার নাম মৈনাক টোধুরী । মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ।”

“হবে হয়তো ।”

“আছা, এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি । সংযুক্তার ডেড বডি তুমি দেখেছিলে ?”

“না । তার কারণ, ও নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে পুলিশ জিজ্ঞাসাদের নামে এমন বাড়াবাড়ি করেছিল যে, আমরা অনেক মেয়েই তখন গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিলাম । তবে শুনেছিলাম অত কাণ্ডের পর ওই নায়েবকাকাই তখন নাকি ওদের ওই বিপদে পাশে এসে দাঢ়িয়েছিলেন ।”

বাবলু হাসল । হেসে বলল, “কাল বিকেলে সংযুক্তার ঘর থেকে এমন একটা চিঠি পেয়েছি, যাতে করে আমার কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ।”

কেয়া বলল, “কী চিঠি ?”

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, “ওর কাকা ডাক্তার আনন্দমোহনের ব্যাপারে তুমি কিছু জানো ?”

“সংযুক্তা আমাকে সব বলেছে । ওর কাকাকে কলকাতার হস্টলে

রেখে ডাক্তারি পড়াতে এবং বিলেত পাঠাতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল ওদের । অথচ উনি বাইরে গিয়ে নিজের পায়ে দাঢ়িয়ে এক পয়সাও নাকি পাঠাননি কখনও । এমনকী সেখানে গিয়ে মেম বিয়ে করে আর এ-দেশে ফিরবেন না এমন মনোভাবও জানান । পরে অবশ্য মতের পরিবর্তন করে দেশেই ফিরে আসেন তিনি । তবে গ্রামে নয়, সুন্দর বেষ্টাইয়ে । সেখান থেকে নাসিকে । সংযুক্তার ঠাকুরদা তখন যে-কোনও কারণেই হোক, দুই ছেলের ওপর বিরক্ত হয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নাতনির নামেই উইল করে দেন । তারপরই মারা যান তিনি । ঠাকুরদা বরাবরই বলে এসেছিলেন নায়েবকাকাকে তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ দেবেন । কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করায় তাঁর যত রাগ গিয়ে পড়ে অধিকাবাবুর ওপর । তাই তাঁকে জন্ম করবার জন্মেই কোশলে ঠাকুরদাকে বেশি পরিমাণ ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অপসারণ করেন ।”

“তাই নাকি ? সে-সময় নায়েবকাকা এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন ?”

“ঠাকুরদা মারা যাওয়ার দিন পর্যন্ত ও-বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি । তবে সব কিছু থেকে বাস্তিত করলেও ঠাকুরদা তাঁর উইলে ভজহরিনা ও নায়েবকাকার আজীবন থাকবার জন্মে দুটি ঘর দিয়ে যান । নায়েবকাকা অবশ্য সে-ঘরে থাকেন না । ঘরটি তালা দেওয়া আছে ।”

বাবলু বলল, “আছা, এই ভজহরিদা লোকটি কেমন ?”

“খুব ভাল লোক । ওর মতো সৎ লোক হয় না । ঠাকুরদার মৃত্যুর দায়টা ভজহরিনাই তো নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন । স্বীকার করে বললেন, তাঁরই ভুলে এটা নাকি হয়েছিল । না হলে জেল হয়ে যেত অধিকাবাবুর ।”

বাবলু, বিলু, ভোম্পল, তিনজনই এতক্ষণ মন্ত্রমুক্তির মতো শুনছিল কেয়ার কথা । সব শুনে বাবলু বলল, “তুমি যে আমাদের বিশ্বাস করে এত কথা বললে, এর জন্মে সত্তি কৃতজ্ঞ আমরা । এতক্ষণে তোমার বাস্তবীকে উদ্ধারের পথ সুগম হল ।”

“সে কি বৈচে আছে ?”

“আছে । এই দাখো তার প্রমাণ ।” বলে একটা ভাঁজ করা চিঠি পকেট থেকে বের করে বাবলু বলল, “এই চিঠিটাই কাল আমি সংযুক্তার ঘর থেকে পেয়েছি ।”

ওরা সবাই মিলে ঝুকে পড়ে সেই চিঠির মর্মেকার করতে লাগল । চিঠিটা এইরকম :

‘যেভাবেই হোক, মেয়েটাকে আমার চাই । আর এই ব্যাপারে আমার হয়ে কাজ করবে মৈনাক চৌধুরী । তারপর অধিকা সেন বুবাবেন কত ধানে কত চাল । শুধুমাত্র ওরই বিশ্বাসযাতকভায় জীবনের কয়েকটা বছর আমার জেনের অন্ধকারে কেটে গেছে । তাই বদলা আমাকে নিতেই হবে । এমন আঘাত দেব ওকে, যাতে করে ও পাগল হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘূরবে । বেঁচেও মরে থাকবে সারাজীবন । আমার সঙ্গে হাত মেলাও চৌধুরী । হিসেবের ঘরে ভুল হবে না । ভুল মণ্ডকেও কাজে লাগাও । ওর বৈমাত্রে তাই ডাক্তার আনন্দমোহনকেও এই ব্যাপারে দলে নাও । তাড়াতাড়ি করো ।’

চিঠিটা যে কাকে লেখা হয়েছে তারও যেমন উল্লেখ নেই, যে সিখেছে তারও নাম নেই ।

বাবলু বলল, “মাথামুছ কিছু বুকলি ?”

বিলু বলল, “বুকলাম । মেয়েটা বৈচে আছে এবং সে বন্দিনী । ওই নেপথ্য নায়কই তাকে সরিয়েছে ।”

কেয়া বলল, “কিন্তু সংযুক্তা এই চিঠি পেল কী করে ?”

বাবলু বলল, “চিঠিতে নামোরেখ না থাকলেও বোৰা যায় এটা নায়েব চৌধুরীকে লেখা । সংযুক্তা কী করে চিঠিটা পেল সেটা একমাত্র সেই বন্তে পাবে । ও ব্যাপারে আমদের মাঝা না ধামালেও চলবে । কিন্তু এই ভুল মণ্ডলটি কে ?”

“ভুল মণ্ডল হল দাগি চোর একটা । একবার এইখানকার গ্রামীণ বাকে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রচণ্ড মার খায় । জেলও হয় দু-চার বছর । সেই থেকে সে বাইরে-বাইরেই থাকে । কিন্তু সংযুক্তার ওই দুঃঘটনার দিন তাকে আমি আবার এই গ্রামে দেখেছি । আমার মনে

হয় সংযুক্তাও দেখেছে ওকে । আর সেইজন্মেই... ।”

“সেইজন্মেই কী ?”

“ওর বাবার সঙ্গে ভুল মণ্ডলের দাকুণ শক্তা ছিল । তাই বোধ হয় তার পেয়ে ওর বাবাকে দিতে গিয়েছিল খবরটা ।”

কারও মুখে কোনও কথা নেই আর । এইভাবে নিঃশব্দে কিছুটা সময় যে কীভাবে কেটে গেল তা কারও ব্যাল নেই ।

একসময় নীরবতা ভেঙে ভোথলই বলল, “আচ্ছা বাবলু, মৈনাক চৌধুরী যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা ও নায়েব চৌধুরীর ছেলে, এ-কথা তুই জানতে পারলি কী করে ?”

“সংযুক্তার ঘরে দেখলাম কিছু ওষুধের স্যাম্পেল ইত্যাদি আছে । বইয়ের ভাঁজে মৈনাক চৌধুরীর নাম লেখা কার্ডও আছে কয়েকটা । তবে ওগুলোর ব্যাপারে আমি কিন্তু যুব একটা মনোযোগ দিইনি । কিন্তু ওই চিঠিটা পাওয়ার পরই মৈনাক চৌধুরী আমার মনে গৈথে যায় । তার পুর ওর নাম করতেই হঠাৎ দেখি জ্বলে ওঠেন নায়েব চৌধুরী । আর উনিই তো বলেন মৈনাক তাইই ছেলে ।”

“সংযুক্তার বেনও ডায়েরি পাসনি ?”

“না । সেটারই খৌজ করছিলাম । মনে হয় ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না । তা ছাড়া ক্ষুলে-পড়া মেয়ে । এমন কিছু বয়সও তো নয় । তবে ওর খাতার পাতায় দু-একটা ছন্দপত্র কবিতা দেখলাম ।”

বিলু বলল, “এখন ওসব কথা থাক । কীভাবে কী করবি ঠিক কর ।”

বাবলু বলল, “হ্যাঁ । কাজের কথাই হোক । সংযুক্তা যে নায়েব-চত্রেই আছে তা বেশ বোৰা যাচ্ছে । ডাঃ আনন্দমোহনের সঙ্গে নায়েবের যোগাযোগ না থাকলে তিনি কখনওই আমাদের ঠিকানা দিতে পারতেন না । মৈনাক চৌধুরী মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ । তাই আনন্দমোহনের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক এবং সেই সূত্রে তাকে হয়তো বাবার ওইদিকে যেতেও হয় । আমরা যদি ধরে নিই সংযুক্তার লেখা চিঠি মৈনাক চৌধুরী মারফত পোস্ট করা হয়েছে, তা হলে কিন্তু যুব একটা ভুল করব না । কারণ ওর দুটো চিঠিতেই ওই একই লাইনের, মানে নাগপুর ও মানমাদের পোস্ট অফিসের ছাপ আছে ।

একটিতে আছে কলকাতার। তা যাক, এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কাল রাতের ওই আগস্টকটি কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, নায়ের চৌধুরীকে চিঠি লেখার কে ওই নামহীন নেপথ্য নায়ক? তা ছাড়া ভুলু মণ্ডলকে সর্বাত্মে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আর খতিয়ে দেখতে হবে কাল নিশিবাতের ওই আগস্টকের লেখা চিঠির সঙ্গে নায়ের চৌধুরীর হাতের লেখার বা সংযুক্তার ঘরে পাওয়া চিঠির সঙ্গে এই লেখার কোনও মিল আছে কি না। তারপরে দেখাব কত গমে কত আটা।”

কেয়া অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। একসময় বলল, “অনেক বেলা হয়ে গেল। তোমাদের তো খাওয়াদাওয়া কিছু হল না।”

বাবলু বলল, “আমাদের কুধা-তৃষ্ণা নেই।”

ভোঞ্জল বলল, “তোর নেই। কিন্তু আমার আছে। বিলুর আছে। কেফটি কখন দুটো খেয়ে বেরিয়েছে, ওর আছে।”

কেয়া বলল, “না-না। আমার জনো চিপ্তা কোরো না। আমি তো ভাত খেয়েই বেরিয়েছি। তোমরা খাও। কিন্তু কী খাবে বলো তো? এখানে তেমন হোটেলপত্তরও কিছু নেই। তবে মিষ্টির দোকান আছে। নই-মিষ্টি খেতে পারো। আর যদি একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়ি যাও, তা হলে যা হোক দুটো ভাল-ভাতের খবশ্বা হতে পারে।”

বাবলু বলল, “তোমাদের বাড়ি যেতে পারলে খুবই ভাল হত। তবে এখন যাওয়া যাবে না। আমরা যাব রাতে। আজ রাতে আমরা দেখব মৃদিংহ নিকেতনের প্রতিক্রিয়া কী। সেই ভয়ঝরের আবিভূতি আজও সে-বাড়িতে হয় কিনা। তুমি শুধু নায়ের চৌধুরী ও ভুলু মণ্ডলের বাড়িটা আমাদের চিনিয়ে দেবে। খুব সর্তকাতার সঙ্গে করতে হবে কাজটা। ওদের মোচড় দিলেই সংযুক্তার খবর পেয়ে যাব। নেপথ্য নায়কও আর আস্থাগোপন করে থাকতে পারবেন না।”

কেয়া বলল, “রাতে কখন যাবে তোমরা?”

“বেশি রাতে যাওয়ার অসুবিধে আছে। আমরা সঙ্গের পরই যাব। অন্ধকারে কেউ চিনবেও না, পথে যাতায়াত করলে সন্দেহও করবে না। তোমার বাড়ি তো আমরা চিনি না, তুমি কোথায় দেখা করবে আমাদের

সঙ্গে?”

ভোঞ্জল বলল, “আমরা যখন যাচ্ছি ওদের বাড়িতে তখন ওর আর দেখা করতে আসবার দরকার কী? সঙ্গে পর্যন্ত ও থেকেই যাক আমাদের সঙ্গে।”

কেয়া বলল, “থাকতে পারলে ভালই হত। কিন্তু শুলের ছুটি হওয়ার আগেই আমাকে বাড়ি পৌছতে হবে। না হলে যদি জানাজানি হয় যে, আমি সকালবেলা তোমাদের সঙ্গে চলে গেছি অথচ সঙ্গে পর্যন্ত ঘরে ফিরলুম না, তা হলে কিন্তু কেলেঞ্চারির শেষ থাকবে না। সংযুক্তার ওই ব্যাপারের পর আমার অন্তর্ধনি ভাবিয়ে তুলবে সকলকে।”

বাবলু বলল, “না-না। কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া ওদের বাড়িতেও ওঠা যাবে না।”

কেয়া বলল, “কেন! ওঠা যাবে না কেন?”

“আমাদের কোন পরিচয়টা দেবে তুমি তোমার বাড়ির লোকদের? সত্তা পরিচয় দিলে তোমার বাড়ির লোকেরা কোনওমতেই আমাদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে দেবেন না তোমাকে।”

“আমার বাড়ি-মানেজের ব্যাপারটা আমার ওপরই হেডে দাও। তোমরা কখন আসছ তাই বলো।”

“ঠিক সঙ্গের সময় যাব।”

“তোমরা তা হলে ওই সময়ে সিংহবাহিনীতলায় অপেক্ষা কোরো আমার জন্যে।”

বাবলু বলল, “এই কথা রইল তা হলে?”

“হ্যাঁ।” বলে উঠে দাঢ়াল কেয়া। তারপর হাসিমুখে বলল, “আমি এবার আসি?”

বাবলু বলল, “এরই মধ্যে আসবে কী? তোমার তো চিফিনের টাইম হয়ে গেছে। চলো, কোথাও বসে একটু খাওয়াদাওয়া করা যাব।”

“তোমরা খাও। আবার আমি কেন?”

“তাই কি হ্যাঁ? আচ্ছা, তোমাদের এখান থেকে বাড়িতে একটা ফোন করা যাবে?”

“হ্যাঁ-হ্যাঁ। বাজারে গেলেই যে-কোনও বড় দোকান থেকে ফোন

করতে পারবে । ”

ওরা পায়ে-পায়ে বাজারের কাছে এল । তারপর একটা পঞ্চের দেকান থেকে ফোন করল বাবলু । ভাগ্য ভাল লাইন পেতে অসুবিধে হল না । বাচ্চুই ধরল ফোনটা, “হ্যালো, কে বলছেন ? ”

“কে, বাচ্চু নাকি ? ”

“ও, বাবলুদ ! কী খবর ? ”

“তোর মাসি এসেছেন ? ”

“হ্যাঁ, এখনও আছেন । তোমরা কখন আসছ ? ”

“শোন, আমরা যেতে পারছি না । তুই বিচ্ছু আর পঞ্চকে নিয়ে এখনই বড়গাছিয়া চলে আয় । লেভেল ক্রসিংয়ে নামবি । আর যত টাকাই লাগুক একটা ট্যাক্সি করে নিবি । আমাদের বাড়ি গিয়ে আমার ভ্রাতার থেকে সেই জিনিসটা—বুঝতে পারলি তো ? নিয়ে নিবি । সাবধানে আনবি কিন্তু । বাড়িতে বলে আসবি, আজ কেউ ফিরব না । ”

ফোন রেখে ওরা বড়সড় একটা দেকানে ঢুকে খাওয়াওয়া সেরে নিল । তারপর কেয়াকে বিদায় দিয়ে ওরা আবার গিয়ে বসে রইল স্টেশনের ওভারব্রিজে । আর সেখানে নিরিবিলিতে বসে বৈশ অভিযান কীভাবে হবে সোটামুটি তর একটা ছক করে নিল । তারপর মিলিয়ে দেখতে লাগল সেইসব চিঠিগুরের লেখাগুলো । আশর্য ব্যাপায় ! কোনওটার সঙ্গেই কোনওটার হাতের লেখার মিল নেই । তবে সংযুক্তার ঘরে যে-চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল অর্থাৎ সেই নেপথ্য নায়কের চিঠি, তার পেছন দিকে ইংরেজি ট্রাক লেটারে ছেটি করে লেখা ছিল এস জেড । এই লেখার অর্থ কী, তা ওদের বোঝগম্য হল না । নায়েব চৌধুরী নায়িকের যে-ঠিকানা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আবার নিশিরাতের আগস্টকের সেই চিঠির হস্তাক্ষর একেবারেই মেলে না । ফলে ওরা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রইল ।

॥ ৫ ॥

প্রায় ঘণ্টা দুয়োক বাদে বাচ্চু, বিচ্ছু চলে এল পঞ্চকে নিয়ে । বাজারের বড় রাস্তার বাবলুরা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য । ওরা আসতেই

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নামিয়ে নিল ওদের । পঞ্চের তো আনন্দের শেখ নেই । সবইকে পেয়ে লেজ নেড়ে কুই-কুই করে কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না ।

বাবলু পঞ্চের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করল । তারপর বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চকে একটা দেকানে বসিয়ে কুরি, মিটি ইত্যাদি খাইয়ে দিল । সকে হতে এখনও অনেক দেরি । তাই ওরা ঘুরিফেরে অপেক্ষা করতে লাগল সকে হওয়া পর্যন্ত । বড়গাছিয়া জমজমাট জায়গা । রোজাই বিকেলের দিকে হট-বাজার জমে ওঠে এখানে । তাই ঘুরে বেড়াতে মন লাগল না ।

ঠিক সকের মুখে ওরা রওনা দিল জগৎবন্ধুতপুরের দিকে । হেঁটেই চলল ওরা । অঞ্চলকারে হাঁটতে-হাঁটতে একসময় পৌছেও গেল । সিংহবাহিনীতলা এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান । দু-একজনকে জিপ্রেস করতেই দেখিয়ে দিল তারা । সেই পূরনো শিবমন্দির ওরা দেখতে পেল । ঘার গায়ে অপূর্ব ট্রোকেটার কাজ । কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরও যখন কেয়া এল না, তখন খুবই বিমর্শ হল ওরা । এমন তো হওয়ার কথা নয় ।

বিলু বলল, “কী ব্যাপার বল তো ? ”

বাবলু বলল, “জানি না । কিছুই বুঝতে পারছি না আমি । ”

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, “হয়তো ব্যাপারটা কোনওরকমে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ওর বাড়ির লোকেরা ওকে আটকে দিয়েছে । ”

তোবল বলল, “কিন্তু জানবে কী করে ? ”

বিলু বলল, “হয়তো কেয়া নিজেই বলেছে । নয়তো স্কুলের মেয়েরা বলে দিয়েছে বাড়িতে । ”

বাবলু বলল, “আমি কিন্তু অন্য ভয় করছি । ”

“কীরকম ! ”

“কেয়াকে বড়গাছিয়া থেকে একা ছেড়ে দেওয়া আমাদের ঠিক হয়নি । ”

“তখন দুপুরবেলা । তখন কিসের ভয় ? ”

“তোদের বলা হয়নি, আমরা যখন স্কুল থেকে কেয়াকে নিয়ে ট্যাক্সিতে

উঠলাম তখন কিন্তু দূর থেকে নায়ের চৌধুরী আমাদের লক্ষ করছিলেন।

বিলু, ভোঁদল দুঁজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, “সর্বনাশ !”

বাচ্চু, বিছু বলল, “তা হলে উপায় ?”

“আপাতত আমরা নৃসিংহ নিকেতনেই গিয়ে উঠব। সেখানে গিয়ে আজকের রাতের অভিজ্ঞতা সংয়োগ করি। আর ভজহরিনাকেও একটু কাজে লাগাই।”

“ওকে কীভাবে কাজে লাগাবে ?”

“ভুলু মণ্ডল আর নায়ের চৌধুরীর বাড়ি নিশ্চয়ই চিনবে ও ?”

ওয়া যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে, তেমন সময় দেখল কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে। একজন বলছে, “পুলিশে খবর দিয়ে কী হবে শুনি ? পুলিশ কী করবে ?”

আর একজন বলছে, “পুলিশ কিছু করুক না করুক, এটা আমাদের সামাজিক কর্তব্য। আমাদের কাজ আমরা করি। মেয়েটা ফুল থেকে যেমন চলে গিয়েছিল তেমনই রামের মা তো ওকে বাস থেকে নামতেও দেখেছে ? এরই মাধ্যে মেয়েটা গেল কোথায় ?”

লোকগুলো চলে গেলে বাবনুর প্রশ্নারের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চোখে-চোখে ইশারা করে সন্তুষ্পন্নে এগিয়ে চলল নৃসিংহ নিকেতনের দিকে। যা অঙ্ককার তাতে পথ চিনে যাওয়াই মুশকিল। তবু বাবনুর কাছে টু ছিল। তাই হেলে পথ দেখে কোনওরকমে এসে হাজির হল বাড়ির সামনে। বাড়িটা তখন প্রেতপুরীর মতন থমথম করছে।

অধিকাবাসু বাড়িতেই ছিলেন। ওদের দেবেই চমকে উঠলেন, “এ কী ! তোমরা ?”

“আমরা আবার ফিরে এলাম। আজকের রাতটুকু এখানে থাকব।”

উঠলেন দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। অধিকাবাসু আশপাশ একবার ভাল করে তাকিয়ে বললেন, “না-না। তোমরা থেকে না। তোমরা চলে যাও। এখানে থাকলে তোমাদেরও বিপদ হবে। আজ দুপুর থেকে এই গ্রামের আর-একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

৪২

“জানি, ওর নাম কেয়া।”

“তোমরা কী করে জানলে ?”

“আমরাই তো ওকে ফুল থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।”

“তোমরা !” অধিকাবাসু অবাক চোখে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, “এই একটু আগেই সে এসেছিল।”

“কে ?”

“গতরাতের আতঙ্ক।” কথাটা বলতে গিয়েও গলা যেন কঠ হয়ে গেল ভয়ে। বললেন, “সেই উষ্ণ-মুখ আমি দেখেছি। উঃ কী ভয়ঝর ! মানুষের মুখ কখনও অমন হতে পারে না। আমার বাবা পর-পর তিনদিন দেখেছিলেন ওই মুখ। আমি একদিন দেখলাম। হয়তো আর দুঁদিন দেখেনেই আমারও শেষ !”

“তাই বলি হয়, তা হলে কেন আপনি চলে যাচ্ছেন না আপনার সন্তানের বাড়িতে ?”

“হ্যাঁ যাৰ। ওদের হাত থেকে সেখানেও বাঁচব কি না জানি না। তবু যাৰ।”

“আপনি কাদের কথা বলছেন ?”

অধিকাবাসু চুপ করে রইলেন।

বাবনু বলল, “শুনুন, আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন। অনেক কথা চেপে গেছেন আপনি আমাদের। আপনার মেয়ের খাতার ভেতর থেকে এমন একটা চিঠি আমি পেয়েছি, যার সূত্র খুঁজলে বোৰা যায় আপনি নিজেও খুব একটা সাধুপূরুষ নন। কোনও ভয়ঝর বাড়িকে আপনি এমনভাবে ধাঁটিয়েছেন, তাই সে আপনার পেছনে শনির মতো ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। আপনার বাবার মৃত্যুটাও অস্বাভাবিক। আপনি জিমিদার লোক। আপনার ঢাকা আছে। প্রতিপত্তি আছে। আপনি অসৎ লোক হয়েও ক্রিমিনাল হিসেবে চিহ্নিত নন। তাই অনেক ব্যাপারেই আপনি আইনের খুটিনাটি দিকগুলো থেকে পর পেয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় পুলিশ গ্রামসন আপনার সম্মান রক্ষা করবার জন্য এইসব ব্যাপার স্বাভাবিক বলে মনে করছে এবং কিছু বলছে না। না হলে আপনার মেয়ের বাপারটাই

৪৩

একটু মনে করে দেখুন না, সেই সময় আপনি মানসিকভাবে ভেঙে  
পড়লেও উইন্ডিট পোস্ট মর্টেমে ওই লাশ কখনও ঝালানো যায় ?”

অধিকাবাবু মাথা হেঁটে করলেন ।

বাবলু বলল, “শয়তানের সহযোগিতা এবং আপনার বনেদিয়ানা  
আপনাকে পুলিশের বামেলা থেকে বাঁচিয়েছে । যাই হোক, সেই ভয়ঙ্কর  
বাতিটি কে হতে পারে সে-কথা আপনার চেয়ে ভাল করে আর কেউ  
বলতে পারবে না । আমরা আপনার মৃত্যেই শুনতে চাই তার কথা ।”

“বলব, বলব, সব বলব আমি ।” বলেই কী যেন দেখে শিউরে  
উঠলেন । বললেন, “ওই ! ওই দাখো, আবার এসেছে সে ।”

“কে ! কে এসেছে !” বাবলুর ঘুরে তাকিয়ে যেই না দেখতে যাবে  
অমনই একটা চাপা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অধিকাবাবু ।

সঙ্গে-সঙ্গে শ্রী ছুটে এলেন ।

বাবলু দেখল একটা ছোরা আমূল বিন্দ হয়েছে অধিকাবাবুর পাঁজরের  
কাছে । আর দেখল সেই ভয়ঙ্কর মুখ বাড়ির ভেতরে প্রবেশ-পথের  
দরজার আড়াল থেকে চকিতে অদ্য হয়ে গেল । পঞ্চ তখন ব্যাকু  
বিক্রমে ধাওয়া করেছে ভয়ঙ্করকে । এখন প্রশ্ন ইল, অধিকাবাবুর  
আততায়ী তা হলে কে ? ভয়ঙ্কর মৃত্যি ছিল সামনের দিকে । আঘাত  
এসেছে পেছন থেকে । রহস্যের পর রহস্য ।

বাবলুরাও আর দাঁড়িয়ে না থেকে পঞ্চকে অনুসরণ করল । একজন  
লোককে ভীষণভাবে তাড়া করেছে পঞ্চ । লোকটা ধানমাটের ওপর  
দিয়ে ছুটেছে । পঞ্চও ছুটেছে । ছুটতে-ছুটতে পঞ্চ ওর দু’ পায়ের হাঁটু  
খাঁজে লাফিয়ে পড়তেই মুখ ঘুরড়ে পড়ে গেল লোকটা । বাবলু, বিলু,  
ভোঞ্বল, বাচু, বিচু, সবাই ওকে গোল করে দিয়ে ধরল । আর পঞ্চ বেশ  
শক্ত করে কামড়ে ধরল ওর টেংরিটা । যাতে কোনওরকমেই পালাতে না  
পারে । লোকটা ওই অবস্থাতেও আগ্রাম চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে  
বাঁচাবার ।

বাবলু লোকটার ওপর টর্চের আলো ফেলতেই দেখল বেশ স্বাস্থ্যবান  
এবং ধরলান একজন লোক । মুখে মুখোশ আঠি । তাই এত ভয়ঙ্কর ।  
বাবলু বলল, “কে তুমি ?”

লোকটির মুখ দিয়ে একটি ভয়াঠ স্বর বেরিয়ে এল ।

বাবলু তার দিকে পিস্তল তাগ করে বলল, “বলো, তুমি কে ?”

লোকটি গোঁ-গোঁ করতে লাগল ।

বাবলু আবার বলল, “মুখোশ খোলো । খোলো মুখোশ । খোলো  
বলছি ।”

লোকটি বলল, “না-আ-আ- ।”

“বিলু !”

শুধু আদেশের অপেক্ষা ! বিলু, ভোঞ্বল, দু’জনেই টেনে লোকটার  
মুখোশ ঘুলে দিতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওর । বাবলু আবাক  
বিশয়ে বলল, “এ কী ! ভজহরিদা ?”

ভজহরি বলল, “হ্যাঁ আমি । আমাকে তোমরা ক্ষমা করো ভাই ।  
পুলিশে দাও । আমি তোমাদের সব বলব ।”

বাবলুর নির্দেশে পঞ্চ ওর পা ছেড়ে দিল ।

বাবলু চুলের মুঠি ধরে তুলে দাঁড় করাল ভজহরিকে । বলল, “যার  
নুন খাচ্ছ, যার আশ্রয়ে আছ, তার সঙ্গে বেইমানি করতে বিবেকে বাধল  
না ?”

ভজহরির চোখে জল । বলল, “এ খুবই অন্যায় । কিন্তু আপনারা  
যদি আমার কথা শোনেন... ।”

“তোমার কোনও কথাই শুনব না আমরা ।”

আবার একটা আর্তনাদ । ভজহরি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । ওর বুকের  
মাঝখানে একটা ধারালো ছোরা এসে গেঠেছে । হয়তো বিষ মাখানো  
ছিল । তাই ক্রমশ যেন কীরকম হতে-হতে মুখটা বিকৃত করে মাটিতে  
লুটিয়ে পড়ল সে । অক্ষকারের বুক চিরে তাঁরের মতো ছুটে গেল পঞ্চ ।  
কিন্তু অনেক পরে যখন সে ফিরে এল তখন বোধা গেল পঞ্চ ব্যর্থ  
হয়েছে ।

ভোঞ্বল বলল, “এ যে দেখছি সরফের ভেতরেই ভূত ।”

বাবলু বলল, “চল, বাড়ির দিকে যাই । এতক্ষণে অধিকাবাবুরও  
নিশ্চয়ই এই দশা হয়েছে । ওর ছুরিতেও নিশ্চয়ই বিদের বদলে মধু  
মাখানো ছিল না ।”

বাচ্চু, বিশু বলল, “ভজহরিদা কি এইখানেই পড়ে থাকবে ?”

বাবলু বলল, “ভজহরি কোথায় ? ওটা তো ওর লাশ। পড়ে থাকুক। পুলিশ এসে তুলবে।”

ওরা সকলে আবার যখন নৃসিংহ নিকেতনে ফিরে এল, তখন বাড়ির উঠোনময় লোক। অধিকাবাবুর স্তৰীর ফিটের ব্যামো। প্রতিবেশীরা তাঁর মুখে-চোখে জলের বাপটা দিয়ে ডান ফেরাবার চেষ্টা করছেন। অধিকাবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। দেহটা কেমন যেন বেঁকে দেছে। মনে হচ্ছে যত্না ও তাঁর বিষত্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই মাটিটাকেই বুঝি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মরদেহের পাশে এসে আকাশের দিকে চেয়ে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি, তিনি হলেন নায়েব কৃকুকিশোর চৌধুরী।

দেখামাত্রই ছলে উঠল বাবলু। ওর দু' চোখেই তখন ক্রোধের আগুন।

নায়েব চৌধুরী বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “কী হে ছোকরা ! কিছু বুঝলে ?”

বাবলু বলল, “বুঝলাম। শঠতা অতি বিষম বস্তু। তা মেয়েটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন নায়েবকাকা ?”

নায়েব চৌধুরী তাঁর পাঞ্জাবির পাকেট হাতড়ে বললেন, “এইখানেই তো রেখেছিলাম। এখন তো নেই দেখছি। বোধ হয় পড়ে গেছে কোথাও।”

“অভিনয় রাখুন। যদি ভাল চান তো মেয়েটাকে ন্ম নায়েব কাছে ফিরিয়ে দিন।”

নায়েব স্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে বললেন, “শোনো, তোমাদের ভেতর থেকে কেউ দিয়ে বরং থানায় একটা খবর দিয়ে এসো। যত কঁকি তো এবাব আমাকেই পোয়াতে হবে। বউমাকে ভেতরে নিয়ে যাও। আব ডেডবডি পাহারা দাও কেউ।”

বাবলু বলল, “ডেডবডি তো এখানে একটি নয়, দুটি।”

নায়েব চৌধুরী আবাক বিশ্ময়ে বাবলুর দিকে তাকালেন, “দুটি !”

“এমন ভান করছেন যেন কিছুই জানেন না ?”

৪৬

“দুটি কোথেকে আসবে ?”

“ভজহরিদার লাশও যে বাহিরে আলাদারে পড়ে আছে।”

চমকে উঠলেন নায়েব চৌধুরী, “ভজহরির লাশ ! কী হয়েছে ভজহরির ?” বলেই ক্রতৃ চললেন ভজহরিকে দেখতে। যেন কথটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না। বাবলুরাও চলল সঙ্গে। চোখে-চোখে রাখতে হবে লোকটাকে। যেন কোনওরকমেই পালাতে না পারে।

ভজহরির মরদেহের সামনে এসে নায়েব চৌধুরী আবাক বিশ্ময়ে চেয়ে রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “এবাব কার পালা ?”

বাবলু বলল, “আব যাই হোক, আপনার অস্তত নয়। আপনি তো এখন রাজার সিংহাসনে বসবেন এই প্রাসাদে।”

নায়েব চৌধুরী বললেন, “আমাকে দেখলে কংস কিংবা যমের অবতার বলে মনে হয়, তাই না ?” তারপর হেসে বললেন, “না হে না। তোমরা যা ভাবছ তা নয়। তবে তোমাদের মনের অক্ষকারটা এবাব দূর করে দেওয়াই ভাল। এসো আমার সঙ্গে।”

নায়েব চৌধুরীর কঠিনবলে এখন আব সকালবেলার সেই উন্নাপটা দেই। বাবলুরা তাই সাহস করেই ওর পিছু নিল। বেশিদূর যেতে হল না। একটি বছ পুরাতন ইট বেঁক-করা জীর্ণ বাড়ির সামনে এসে বললেন, “এই আবাব মার্বেল প্যালেস। অধিকা সেনেদের প্রচুর টাকা-পয়সা চূরি করেছি তো, তাই সামান্য একটু পলেন্টোও লাগাতে পারিনি।”

বাবলুরা কেনও কথা না বলে বাড়ির ভেতর ঢুকল।

নায়েব চৌধুরী ডাকলেন, “গণেশ !”

হাটপুট, বেঁটে, কালো একটি ছেলে এসে দীঢ়াল সেখানে।

“মা ষাটকুনকে বলো, এই ছেলেমেয়েগুলো আজ রাতে এখানে থাবে। থাকবেও এখানে।”

বাবলু বলল, “না না। কেনও দুরকার নেই।”

“দুরকার আছে কি নেই সেটা আমি বুবাব।”

বাবলুরা দেখল বাড়ির বাহিরেটা হত্ত্বী হলেও ভেতরটা মন্দের ভাল।

যরের দেওয়ালের একাংশ ভুঁড়ে শোভা পাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যর একটি বহু পূর্বানু তৈলচিত্র।

নায়েব চৌধুরী বললেন, “আমার কথাবার্তা শুনে নিশ্চয়ই তোমরা খুব রেখে আছ আমার উপর ?”

বাবলু বলল, “স্বাভাবিক।”

“এই মেরে দুটি কে ?”

“আমাদের বেনের মতো। বাচ্চু, বিচ্ছু ওদের নাম।”

“বাঃ বেশ-বেশ। আসলে ব্যাপারটা কী জানো ? মানুষটাই আমি একটু রুক্ষ প্রকৃতির। তা ছাড়া নায়েবি চাল চালতে গিয়ে সব সময় কড়া মেজাজে খাকার ফলে মেজাজটাও একটু খিচিখিটে হয়ে গেছে। অধিয়ভাষ্য ও হয়েছি।”

বাবলু বলল, “আপনার ব্যক্তিব্য শুরু করুন।”

নায়েব চৌধুরী বলতে লাগলেন, “হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার এই ব্যতীবের জন্যে গ্রামের কোনও লোকই দেখতে পারে না আমাকে। সেনেদের বাড়ি আমরা কয়েক পুরুষ থেরেই নায়েবি করে আসছি। অধিকার বাবা হরিপদ সেন ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। আমার সঙ্গে তিনি বড়ুর মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে হসেন অধিক। ত্রী গত হলে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সেই ছেলেই ডাঃ আনন্দমোহন। ছেলে যখন পাঁচ বছরের তখন ওর মা মারা গেল। এর পর হরিপদবাবু আর বিয়ে করেননি। দেখতে-দেখতে বড় হল দুই তাই। দু'জনে দুই প্রকৃতির হল। বড়টি যেমন অসৎ, ছেটিটি তেমনই সৎ। প্রথমে অধিকার কথাই বলি। সাটা, জুয়া, রেস থেকে মায় জলিয়াতি, প্রতারণ কোনও কিছুতেই জুড়ি নেই তার। সন্ট লেকে এক ভাগাহীনের সম্পত্তি নাকি ব্যাকমেল করে ভোগ করছে। আর সাইমন জাভেরি নামে ওর এক স্বাগলিং পার্টনারকে বিশ্বাসঘাতকতা করে এমনভাবে ফাসিয়েছে যে, বিনা দোষে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে বেচারির। সাইমন জেলে যাওয়ার পর তার একমাত্র শিশুকন্যাটি রেখে ভুঁগে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আর সাইমনের বড় মনের দুঃখে স্বামী ও কন্যার শোকে খিদিরপুরের একটি বস্তিতে গলায় শাড়ির কাস

বেঁধে আঞ্চলিক করে। এর পর একদিন জেল ভেঙে পালিয়ে আসে সাইমন। তারপর যিশু খিস্টের নামে শপথ নিয়ে উঠেপড়ে লাগে অধিকা সেনের স্ফুরণ করবে বলে। সাইমনের ভয়েই সন্ট লেকের বাড়ি ছেড়ে এই গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে এসেছে অধিকা সেন। কিন্তু এলে কী হবে, ছায়া যেমন মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না, সাইমনও তেমনই পিছু ছাড়ে না অধিকার। তাই খুজতে-খুজতে একদিন সে এই আমেও এসে হাজির হয়।”

গণেশ নামের সেই কাজের লোকটি তখন ট্রে-তে করে ছ’ কাপ চা আর প্রতোকের জন্য ডিমের শুমলেট নিয়ে এসেছে। আনেনি শুশু পদ্ধুর জন্য। পদ্ধু তাই চট করে জিভ দিয়ে নিজের মুখটা একটু চেঁটে নিয়ে বাবলুর দিকে তাকাতেই বাবলু ওর ভাগ থেকে আধখানা পদ্ধুকে দিল।

নায়েব চৌধুরী বললেন, “নাও, খেয়ে নাও। যা বলবার এখনই বলি। পরে হয়তো আর বলবার সময় পাব না। এখনই পুলিশ এলে অনেক দিক সামলাতে হবে আমাকে।”

বাবলু বলল, “ও-বাড়ির সঙ্গে আপনার তো এখন কোনও সম্পর্ক নেই। তা হলে দায়টা কিসের আপনার ?”

“আরে, ও-বাড়ির সব কিছুই তো এখন আমার। যদি বেঁচে থাকি তা হলে আমাকেই তো দেখতে হবে সব। অধিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু ওর ভাই আমাকে বিশ্বাস করে। যাক, যা বলি মন দিয়ে শোনো।”

নায়েব চৌধুরী আবার বলতে শুরু করলেন। “সাইমন অসের আগের কথা বলি। অধিকা তো শহুর ছেড়ে আমে এল। এসে প্রথমেই যড়বন্দু করল এখানকার গ্রামীণ ব্যাকে ডাকাতি করবার। ওর প্রধান শাগরেদ হল তখন ভুলু মণ্ডল। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম কয়েকজনকে। তাই ওদের পরিকল্পনাটা ভেঙ্গে গেল। ভুলু মণ্ডল ধরা পড়ল দলবল সমেত। মারধোরও গেল। জেলও হল কয়েক মাস। ওর ধারণা হল ব্যাক ডাকাতিটা ছুল। আসলে ওকে ফাঁদে হেলার জন্যে অধিকা সেনই এই চাল চেলেছিলেন। ফলে ভুলুর সঙ্গেও ওর আজীবন শক্তি গড়ে উঠল।

“ঘাক গে। অল্প সময়ের মধ্যে ঘটটা পারি বলি। এবার অধিকার খাওয়ার কথাই বলা ঘাক। আগেই বলেছি হরিপদ সেন আমাকে বিশ্বাস করতেন এবং বন্ধুর মতো ভালবাসতেন। অধিকার মতিগতি দেখে তিনি ঠিক করলেন, এর হাতে সম্পত্তি দেখাশোনার ভাব পড়লে দু’ দিনে সে বেচেবুচে লাটে তুলে দেবে সব। তাই আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম ওদের দুই ভাইকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে নাবালিকা সংযুক্তির নামে সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিকানা উইল করে দেওয়া হবে। সেই জমি দেখাশোনা করব আমি। আমার ভাগে দশ বিঘে ধানজমি আর ভজহরিকে পাঁচ বিঘে জমি দেওয়া হবে। আমার মাসিক বেতন হবে এক হাজার টাকা। ভজহরিকে তিনশো।

বাবলু বলল, “একটা কথা, উনি ছেট ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন কেন?”

নায়ের চৌধুরী বললেন, “ওকে অবশ্য বঞ্চিত ঠিক বলা যায় না। তবে ছেট ছেলে লিখিতভাবেই জানিয়েছে যে, বর্তমানে নিজের চেষ্টায় এবং মেহনতে সে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে। তাই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর তার একটুও লোভ নেই। সম্পত্তি পেলেই কী, না পেলেই বা কী, আমের মাটিতে সে কোনওদিনই পা রাখবে না।”

“কারণটা কী?”

“মনে হয় অধিকার দুর্বিহার এবং যে-কোনও কারণে বাবার ওপর অভিমানই তার কারণ। এমনকী বাবার মৃত্যু সংবাদ পেরেও সে আসেন।”

বাবলু বলল, “তারপর?”

নায়ের চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন, “কোভাবে যেন উইলের ব্যাপারটা জানতে পেরে গেল অধিকা। তাই হঠাৎ একদিন আমার নামে চোর বন্দনাম দিয়ে আমাকে মারতে-মারতে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। হরিপদ সেনের সামনেই এইসব হল। উঃ সে কী অপমান! সেদিনের কথাটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। কী দিয়ে দেরেছিল জানে? পায়ের জুতো দিয়ে।”

বিশ্বিত বাবলুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, “সে কী?”

“তোমাদের কাছে আমি এতটুকুও নিখো বলছি না বাবা। নেহাত ওরা আমার মনিব, বা ওদেরই দয়ায় ছেলেটাকে আমি কঠেসূচি বি এ পাশ করিয়েছি। সে এখন মেডিকেল বিপ্রেজেন্টেটিভ। তাও ওদেরই ছেট ছেলের জন্যে। ডাঃ আনন্দমোহন এখন নাসিক শহরের একজন মস্ত বড় গাহিনি। তার ‘আরোগ্য নিকেতন’ কত রোগী যে জীবন ফিরে পায় তার ঠিক নেই। হাজার হলেও বিলেতে ফেরত ভজ্জন তো! পদারও খুব। যাই হোক, আমার এই অপমানের, বিশ্বেত মার খাওয়ার ব্যাপারটা ওরা কেউ জানে না। আমার ছেলেও না। ভাস্তরও না। আসলে আমার ওপর অধিকার রাগের আরও একটা কারণ হচ্ছে হরিপদ সেনের ইচ্ছা ছিল সংযুক্তির বিয়ে এমন একজনের সঙ্গে হবে যে কিনা ঘরজামাই হয়ে থাকবে এখানে। তা আমার ছেলে মৈনাক অত্যন্ত সুপুর্ণ। সংযুক্তি বড় হলে ওর সঙ্গেই মৈনাকের বিয়ে দেব এমন একটা সন্দিগ্ধ আমি প্রকাশ করেছিলাম। এটা অবশ্য আমার উচ্ছিতা হয়েছিল। ম্যাদায় লেগেছিল বাবুদের। তাই এই অপমান নিজের ভূমের প্রায়শিক্ত মনে করে আমি নীরবে সহ্য করেছিলাম। কিন্তু এত কানের পরও আমি এমনই এক কুকুর যে, হরিপদ সেন ডাকলে আমি কৃতজ্ঞতাবোধে না দিয়ে পারতাম না। খুব দরকারে অধিকাও ডাকত। আমিও যেতাম। যাক, পরে শুনলাম বুড়ো সম্পত্তির উইল করেছে এবং নৃসিংহ নিকেতনে যে-ঘরটিতে আমি থাকতাম সেই ঘরটি নাকি আমাকেই দিয়েছে। ভজহরিও পেয়েছে তার ঘরখানি। অবশ্য উইলের ব্যাপারটা কতদুর সত্তি তা ভগবানই জানেন। আর ওই ঘর পেয়েই বা লাভ কী?”

বাবলু বলল, “ঘর যে আপনাকে দিয়েছে এই কথা কে বলল?”

“হরিপদ সেনের মৃত্যুর পর অধিকাই বলেছে। অধিকা কতদুর শ্যাতান একবার ভেবে দ্যাখো, বুড়ো বাপটাকেও একদিন ঘুমের ত্যন্ত খাইয়ে মেরে দিলে।”

“বাবকে মারবার কারণ?”

“দুটো কারণ, এক হচ্ছে সম্পত্তির ব্যাপারে ছেলেকে অবিশ্বাসের রাগ। দ্বিতীয় কারণ, খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে জন্ম করা। আমি তখন ওই শক্তপূর্ণতে আবার যাত্যাত শুরু করেছি তো।

হরিবাবুর হাই প্রেসার ছিল। সকাল-সন্ধেয় প্রেসারের জন্মো ওযুধ খেতে হত ওকে। সেদিন আমার উপস্থিতিতেই বেশ ভারী ধরনের দুটো ওযুধ ভজহরির মাধ্যমে খাইয়ে দেওয়া হয়। পরে ভাঙ্গার সন্দেহ প্রকাশ করলে অধিকার মন্তব্য, সে ঠিক ওযুধই দিয়েছিল। আমিই নাকি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘবিশত এই কাজ করেছি ওদের ওপর প্রতিশেধ নেব বলে। নির্দেশ ভজহরি তখন দায়টা ওর নিজের ধাড়েই তুলে নেব। বলে, সেই নাকি ভুল করে ঠিক ওযুধের বদলে ভুল ওযুধ দিয়ে বসে আছে।”

বাবলু বলল, “আপনি এত বলছেন। আপনার একটি কথাও আমরা অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু অধিকারাবুকে দেখলে একবারও তো মনে হয় না উনি এত খারাপ লোক বলে। কী সুন্দর ভদ্র চেহারা।”

“আরে, বনেন্দি জিমিদারের রক্ত বইছে তো ওর শরীরে। সুন্দর, সুপুরুষ চেহারা। তবে ও সম্পূর্ণ অনা প্রকৃতির হয়ে গেছে সংযুক্তির ওই ব্যাপারটার পর। তারপর থেকে কেন জানি না, আমার সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করছে। হ্যাতো এতদিনে ভুলটা বুঝতে পেরেছে নিজের।”

বাবলু বলল, “যাক, এবার সাইমনের কথা বলুন।”

“হাঁ, বলছি। সাইমন জাভেরি। আংলো হিস্টান। আগে কোনও এক সার্কাস দলে কাজ করত। জাগলিং-এ পাকা হাত। একজন মানুষ একটি কাটের বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত আর সাইমন একটি-পর-একটি ছোরা নিক্ষেপ করে তাক লাগিয়ে দিত সকলকে। হেরাগুলো বোর্ডের গায়ে গেঁথে থাকত। আর মানুষটি চলে আসত হাসতে হাসতে। অবৰ্থ হাতের টিপ। একটিও ফসকাত না। দিনের-পর-দিন এই খেলাই দেখাত সে। একদিন কী মতিছেম হল, সার্কাস দলের একটি মেয়েকে বিয়ে করে চাকরি ছেড়ে চলে এল সে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই বিপথগামী হল। এবং যা হয়, অধিকা সেন্টের মতন বিশ্বাসী বন্ধুরাই একদিন ফাঁসিয়ে দিল তাকে। সে যাই হোক, ওর নাম কিন্তু সাইমন জাভেরি। মৃত্যুনাম আতঙ্কের মতন একদিন সে এসে হাজির হল এই গ্রামে। এবং প্রথমেই তার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিল আমাকে। তিল-তিল করে এই পরিবারকে আতঙ্কের মুখে ঠেলে দেওয়ার

পরিকল্পনা করল। ভুলু মণ্ডলকে আগেই হ্যাত করেছিল সে। এখন আমাকে করবল। সময়টা কিন্তু সেই সময়, হরিপদ সেন যখন বেঁচে ছিলেন এবং যখন আমি অধিকার হাতে মার থেয়ে দারুণ মনোবেদনায় ভুগছি। তাই চট করেই টোপটা গিলে নিলাম আমি। ভাবলাম, প্রতিশেধ নেওয়ার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। তা ছাড়া, এই ডাক সহিমনের ডাক। যিদিরপুরের নববাদক। ওর ডাক প্রত্যাখ্যান করার বিপদও আছে। ও একটা জাস্ত গোখরো ছাড়া কিছুই নয়। ওর সঙ্গে হাত মেলালে আর যাই হোক, নির্ভয়ে থাকা যায়। কেননা আমারও একটা হেলে আছে। তাকেও তো তার কাজে বছরের কয়েকটা মাস শুধু বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়। সাইমনকে চটালে যদি সে ওর কোনও ক্ষতি করে সেই ভয়েই আরও রাজি হলাম ওর কথায়।

“এর পর একদিন সাইমনের কাছ থেকে নির্দেশ এল নৃসিংহ নিকেতনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার। হরিপদ সেনকে শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে-দেখিয়ে মারবার চৰ্বাস্তু করেছিল সাইমন। ওর ওপরও আমার তখন রাগ ছিল প্রচণ্ড। তবু বলেছিলাম সাইমনকে, ওই বুড়ো মানুষটিকে ওর ক্রোধবহু থেকে দূরে রাখতে। বুড়োকে মেরে ওর লাভ কী?

“সাইমন বলেছিল, সেটা তার বাপোর। লাভ-লোকসনারে হিসেব সে পরে করবে। বলে বর্মা মুলুক থেকে নিয়ে আসা ওই ভয়াবহ মুরোশটি আমার হাতে দিয়ে বলে গেল, কীভাবে কী করতে হবে।”

বাবলু বলল, “কী নিষ্ঠুর পরিকল্পনা।”

“হাঁ। নিখুঁত এবং নিষ্ঠুর। যাই হোক, এই কাজ করতে গেলে ভজহরির সাহায্য একান্তই দরকার। আমি ওকে সাইমনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে এই কাজ করতে রাজি করালাম। ভজহরি যেমন আমার অনুগত ছিল, তেমনই সাইমনের ব্যাপারেও ভয় ছিল তার। তাই ও করত কী, সংযুক্ত যখন ওর মায়ের সঙ্গে সঙ্গেবেলা ঠাকুরঘরে যেত সঙ্গে-প্রদীপ দিতে, ঠিক সেই সময় আবছা অফিকারে বুড়োর ঘরের জানলার কাছে দাঁড়াত। ওই সময় অধিকা কথনও বাঢ়ি থাকত না। তাই এই কাজের সুবিধেও হত। তবে এই কাজ তো বেশিদিন করতে হয়নি। পর-পর তিনদিন দেখিয়েছিল। চারদিনের দিন বিকেলেই

বৃত্তের অস্থাভাবিক মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ তোমরা তো জানো।

“এর পর বেশ কিছুকাল নিরপেক্ষে কাটল। কিন্তু তারপর একদিন এমন একটা চিঠি এল সাইমনের কাছ থেকে যেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কী ভয়ানক চিঠি। সেই চিঠিতে ছিল নৃসিংহ নিকেতন থেকে সংযুক্তকে বরাবরের জন্যে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। সংযুক্তার ওপর আমার দুর্বলতা ছিল। ওকে আমি কন্যার মতো স্নেহ করতাম। তাই অনেক ব্যোলাম সাইমনকে। উত্তরে সে বলল, অনা কেউ হলে বিবেচনা করে দেখত। কিন্তু যেহেতু সংযুক্ত অধিকার একমাত্র সন্তান, অতএব কোনও ক্ষমা নেই। শুধু তাই নয়, এও বলল, ওর কথামতো কাজ না করলেই বিপদ হবে।”

বাবলু বলল, “সাইমনের চিঠিটা আমাদের কাছে আছে। সেই চিঠির পেছনে দৃষ্টি ইঁরেজি অঙ্গর ছিল, এস আর জেড। এখন বুঝলাম এর অর্থ সাইমন জাতেরি।”

“কিন্তু ও-চিঠি তোমরা কী করে পেলে ?”

“সংযুক্তার বইয়ের মধ্যে ছিল। আপনার ছেলের নামের কার্ডও ছিল দু-একটা।”

“মৈনাক বাইরে থেকে ফিরে এলেই দেখা করত ওর সঙ্গে। আমার মনে হয়, এইরকম কিছু যে একটা ঘটবে মৈনাক বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিল এবং কোনওভাবে চিঠিটা তার হাতে পড়ার ওই চিঠি দেখিয়ে সে সতর্ক করে দিয়েছিল সংযুক্তকে। তা যাক, আমি মনে-মনে যা কিছুই ভাবি না কেন, ওরা কিন্তু ঠিক ভাইবোনের মতোই মানুষ হয়েছিল। কাজেই কেউ কি চায় তার বোনের কোনও ক্ষতি হোক ?”

বাবলু বলল, “আবার এমনও হতে পারে, আপনার ছেলে হ্যাতো কিছুই জানে না। সংযুক্তাই কোনওভাবে আপনার ঘর থেকে আবিধার করেছিল চিঠিটা।”

“হতে পারে। যাই হোক। হঠাৎ একদিন ভকুম হল মেয়েটাকে তব দেখাও। আমরা তখন ওর হাতে খেলার পুতুল। বিবেক, বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ভজহরি তব দেখাল ওকে। তারপর সে কী কান্না ওর। বলল, ওর যদি কোনও উপায় থাকত তা হলে এখনই এখান থেকে বিদায়।

নিত।

“ভয় দেখানোর পরের দিনই সংযুক্তাকে সরিয়ে দিল ওরা। সাইমন বোধ হয় বুকাতে পেরেছিল আমাদের দুর্বলতা। তাই ভুল মণ্ডলকে দিয়ে এই কাজটা করালো। তবে মেয়েটাকে ওরা মারেনি। আমার শেষ অনুরোধটুকু সাইমন রেখেছে। এই ঘটনার পাঁচদিন পর এক গভীর রাতে ওরা কোথা থেকে যেন অন্য একটা মেয়ের লাশ এনে ফেলে রাখল কানা দামোদরের কুরিপানায়। তার পরনে সংযুক্তার সব কিছু। এমনকী ঘড়িটিও পর্যন্ত বাঁধা ছিল হাতে।

“আমার কাছে নির্দেশ এল লাশ জালিয়ে দেওয়ার। থানা-পুলিশ করিয়ে পোস্টম্যার্টেমের আমেলা কাটিয়ে বহু কটে সংকার করলাম দেহটা। পুলিশও তলিয়ে দেখল না ব্যাপারটা। সংযুক্ত পুলিশের খাতায় মৃত ঘোষিত হলে ওর জন্যে তদন্ত করাও বন্ধ হল। অবশ্য শবদাহের ব্যাপারে ভুলু মণ্ডলও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল আমারকে। পোস্টম্যার্টেম হ্যানি।

“এই ঘটনার পর থেকেই অধিকা কেন জানি না আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে উঠল। এমনকী কাকা ছাড়া কথা বলত না।

“ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ওইখানেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেঁচো খুড়ে সাপ বের করল ভুলু মণ্ডল। আরও চমক দেখাবার জন্যে জের করে মেয়েটাকে দিয়ে ওই চিঠিশুলো না লেখালেই পারত। ওদেরই নির্দেশে এই চিঠিশুলো আমি মৈনাককে দিয়ে পোস্ট করিয়েছিলাম নাগপুর ও মানমাদ থেকে। একটা চিঠি অবশ্য কলকাতায়। অতএব এই নটিকের অভিনয়ে ভজহরি ও মৈনাক কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দেশি।”

বাবলু বলল, “নায়েবকাকা, আমরা আগামোড়াই আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। যে কাহিনী আপনি শেনালেন আমাদের, তা নিয়েই দেখছি একটা বই হয়ে যায়।”

নায়েব চৌধুরী বললেন, “আমি কিন্তু বুঝ ব্যবহার করলেও তোমাদের ওপর এতকুণ্ড রাগ করিয়ি। আমারই নির্দেশে ভজহরি কাল রাতে ওই মুখোশ পরে তোমাদের ভয় দেখিয়েছিল। যাতে তোমরা ছেলেমানুষেরা ভয় পেয়ে পানিয়ে যাও। তোমাদের নাম আমি শুনেছি। তোমরা যে

এই ব্যাপারে নাক গলিয়েছ, এ-খবর সাইমনের কাছেও চলে গেছে। তাই তো নিজে এসে খুন করে গেছে ও দু-দুজনকে। পাছে ওরা তোমাদের কাছে ওর কথা বলে ফেলে তাই।”

বাবু, বিচু বলল, “এই যে আপনি সব বলে দিলেন, আপনার কোনও বিপদ হবে না ?”

“যে-কোনও মুহূর্তে হতে পারে। নির্দেশ ভজহরি যখন নির্দেশ মেনে কাজ করা সহেও এইভাবে সাইমনের ছুরিতে প্রাণ দিল তখন স্বার্থে ঘালগলে আমাকেও তো যে-কোনও মুহূর্তে সরিয়ে দিতে পারে। এই যদি পরিণাম হয়, তবে ওর হয়ে কাজ করে লাভটাই বা কী ? করবই বা কেন ?”

বাবু বলল, “সাইমন ওর নিজের স্বার্থের জন্যে আপনাকে আচ্ছা জালে জড়িয়ে নিল তো !”

নায়েব চৌধুরী বললেন, “আমি এখন কী ঠিক করেছি জানো ?”

বাবু বলল, “কী ?”

“সাইমনের মুখোমুখি যদি হতে পারি তা হলে আমি নিজেই ওকে খুন করব।”

“পারবেন ?”

“পারতেই হবে। না হলে আমার মৈনাককেই হ্যাতো শেষ করে দেবে কোনওদিন। আমার জীবন দিয়ে যদি ছেলেটার জীবন রক্ষা করতে পারি তো কৃতি কী ?”

“খুব ভাল কথা। আচ্ছা, সংযুক্তকে নিয়ে গিয়ে সাইমন কোথায় রেখেছে বলতে পারেন ?”

“বিদিরপুরে সাইমনের শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু সংযুক্ত সন্তুষ্ট বজবজের চড়িয়াল বাজারে ভুলু মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে আছে।”

“ভুলু মণ্ডলকে তো আমরা চিনি না।”

“বেঁটেখাটো চেহারা, ফর্সা রং। মুখময় বসন্তের দাগ। কপালের ডান দিকে সাদা দাগ। এই নাও ওর ঠিকানা।”

“আজ দুপুরবেলা কেয়াকে যে ধরে নিয়ে গেল।”

“রাখবার ওই একটাই জায়গা ওদের। নিয়ে গেলে ওখানেই

রাখবে। নয়তো কাল সকালে কানা দামোদরের কচুরিপানার গাদায় পাওয়া যাবে মেয়েটার লাশ। তোমরা কি পারবে ওদের খপ্পর থেকে মেয়ে দুটোকে উদ্ধার করতে ?”

বাবু বলল, “পারব। এই কাজ করব বলেই তো এসেছি আমরা।”

“বেশ। যা করবে খুবই সাবধানে করবে কিন্তু। মনে রেখো, সাইমন জাতেরি একটা গোখরো সাপ। আরও মনে রেখো, ওর দ্বাণশক্তি এমনই যে, দশ হাত দূরেও ওর শক্তিপন্থের কেউ এলে গঞ্জে টের পায় ও।”

“আপনার নির্দেশ আমাদের দারুণ কাজে লাগবে। ঠিক আছে, আমরা আসি।”

“সে কী ! এই রাতদুপুরে কোথায় যাবে ? কী করে যাবে ?”

“যেতেই হবে আমাদের। সকাল পর্যন্ত বসে থাকার সময় কই ?”

“তা হলে যা হোক দু মুঠো খেয়ে নাও অস্তুত।”

“আমাদের নষ্ট করবার মতো একটুও সময় নেই কাকাবু।”

নায়েবকাকার স্ত্রী এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন বোধ হয়। দরজার আড়াল থেকেই বললেন, “আমার রামা হয়ে গেছে বাবা। ডিমের বেল আর গরম ভাত দুটো খেয়েই যাও।”

বাবুরূ যখন থেতে বসল তখন কে যেন এসে খবর দিল, পুলিশ এসে গেছে। নায়েবকাকা ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

## ॥ ৬ ॥

বাত তখন দশটা। এত রাতে এখানে কোনও পরিবহণই নেই। পাওয়া গোয়েন্দারা তাই সদলবলে হাঁটা শুরু করল। হাঁটতে-হাঁটতে যখন বড়গাছিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন হঠাৎ দেখল একটা মালবাহী লরি সামনের হেডলাইট দুটো ঝেলে ভীষণভাবে ছুটে আসছে ওদের দিকে। বাবুর কেন জানি না, মনে হল, চালকের উদ্দেশ্য ভাল নয়। ও সকলকে সতর্ক করে পথের একপাশে সরে দাঁড়াল। লরিটা সজোরে চলে গেল ওদের গা ঘেঁষে। লরিটা ড্রাইভার গায়ের জ্বালায় একটা খারাপ কথা শুনিয়ে গেল ওদের।

বাবু বলল, “কী ব্যাপার বল দেবি ? এমন তো হওয়ার কথা নয়।

যাই হোক, গাড়ির নম্বরটা মনে রাখ । ডরু, বি.কে. ২০৮ । ”

বিলু বলল, “নম্বর মনে রেখে লাভ কী ? নম্বর যদি ফল্স হয় ?

“হোক না । এখন এই নম্বরটাই তো নম্বর । আমরা কোনও একটা ট্যাক্সি পেলেই পিছু নেব ওর । ছাড়া হবে না বাছাধনকে । ”

“আর ওকে পেলে তো ? ”

“আমাদের শক্রপক্ষের গাড়ি যদি হয়, তা হলে আবার আমাদের অক্রমণ করবার চেষ্টা করবে । আর তা যদি না হয়, তা হলে তো ল্যাটা চুকেই গেল । ”

ভোবলু বলল, “কিন্তু এখন এই এত রাতে ট্যাক্সি আমরা কোথায় পাব ? ”

“বড়গাছিয়ায় গেলেই পেয়ে যাব । তা ছাড়া কত রাত ? রাত এখন দশটা । এ-পথে রাত এগারোটা পর্যন্ত বাস চলে । বাস, মিনি যা হোক ধরে নেব । তারপর ডোমজুড় গেলেই পেয়ে যাব ট্যাক্সি । ”

বাবলুর কথাই ঠিক । বড়গাছিয়ার লেভেল জনিংয়ের কাছে যেতেই দেখল লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ট্যাক্সি । এরা সবাই আমতার ঘরে ধরছিল । ওদের দেখেই একজন ড্রাইভার এগিয়ে এসে বলল, “কোথায় যাবে ভাই, আমতা ? ”

বাবলু বলল, “না । আমরা হাওড়ার দিকে যাব । ”

“হাওড়ার কোথায় ? ”

“ধরুন হাওড়ার স্টেশন । সেখান থেকে যাব বজবজের চড়িয়াল বাজার । ”

“ওরে যাৰ ! মে তো অনেক দূৰ । যেতে-যেতেই ভোৱ হয়ে যাবে । তা ছাড়া ভাড়াও লাগবে অনেক । যেমন ধৰো না কেন, এখান থেকে হাওড়া দেড়শো টাকা । হাওড়া থেকে বজবজ আৱণ দুশো । মোট সাড়ে তিনশো টাকা । ”

বাবলু ওৱ পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বেৱ করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল, “এটা রাখুন । যাওয়াৰ মুখে একবাৰ আমাদের বাড়িৰ কাছে থামাবেন । বাকি টাকটা দিয়ে দেব । ”

বিলু, ভোবলু বলল, “গাড়ি যাওয়াৰ দৱকাৰ কী ? টাকা তো আমাদের

কাছে আছে । ”

বাচ্চু বলল, “আমিও তোমার কথামতো শ’ পাঁচেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম । ”

ড্রাইভার অল্পবয়সী বাঙালি যুবক । বলল, “থাক, এতেই হবে । আৱ গোটা পঞ্চাশেক টাকা বৰং আমাকে দিয়ো । কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো ? এই এত রাতে তোমরা কেন যাচ্ছ ওদিকে ? ”

বাবলু বলল, “আমরা যে-কাজে যাচ্ছি, সে-কাজেৰ কথা আগেভাবে কাউকেই বলা উচিত নয় যদিও, তবুও আপনাকে দাদার মতো ভেবেই বলি, দাদা নিশ্চয়ই ভাইদেৱ দৃঢ়খ্যা বুবৰেন । ”

“বেশ তো, বলো । সেৱকম যদি বুবি তা হলে হয়তো আমি তোমাদেৱ কাছ থেকে ভাড়াই নেব না । শধু আমাৰ তেলেৱ দামটুকু দিয়ে দিয়ো তোমরা । ”

“না-না । ভাড়া নেবেন না কেন ? টাকা তো আছে আমাদেৱ কাছে । আসলে ব্যাপার কী জানেন, কিছু বন লোক আমাদেৱ পেছনে লেগেছে । আজ দুপুৰে আমাদেৱ এক বোনকে চুৰি করে নিয়ে গেছে তাৰা । আমরা সন্দেহ কৰছি, বজবজেৰ চড়িয়াল বাজারেৰ এক ঠিকানায় তাকে রেখেছে । তাই আৱ দেৱি কৰছি না আমরা । চেষ্টা করে দেৰি যদি কোনও উপায়ে তাকে উদ্ধাৰ কৰতে পাৰি । ”

কিন্তু এ-কাজেৰ যুকি তোমরা নিজেৱা নিলে কেন ? পুলিশে খবৰ দিলেই পাৰতে । ”

“পুলিশে খবৰ দিলেই হৈবো কী ? আমরা স্থানীয় পুলিশকে জানাৰ । তাৰা ফোনে ওখানকাৰ পুলিশকে জানাৰ । এবাৰ সেখানে যদি ওদেৱ কোনও স্পষ্টি থাকে তা হলেই তো ভেস্টে যাবে সব । চোখেৰ পলকে সৱিয়ে দেবে মেয়েটাকে । তাৰ চোয়ে বৰং আমরা কোনওৱকমে ওৱ সন্ধান পেলেই স্থানীয় লোকজনেৰ সাহায্য নিয়ে উদ্ধাৰ কৰব ওকে । ”

ড্রাইভার কিছুক্ষণ বাবলুৰ মুখেৰ দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “তোমাদেৱ বেশ বুদ্ধি আৱ সাহস আছে তো । চলো, আৱ দেৱি না করে উঠে বসো তোমৰা । ”

বাবলু ট্যাক্সিতে বসেই বলল, “আৱ-একটা কথা । একটু আগে একটা

বেপরোয়া লরি কেন জানি না আমাদের চাপ্পা দিতে আসছিল । ওর নম্বর হচ্ছে ডুরু বি. কে. ২০৮ । যদি কোনও রকমে লরিটাকে দেখতে পাওয়া যায় তা হলে সর্বাংগে পিছু নিতে হবে ওর । ”

“তাতে লাভটা কী ?”

“যদি ওটা দুর্ভাগ্যের লরি হয়, তা হলে নিশ্চয়ই ওর পেছনে ধাওয়া করে আমরা কিছুটা সফল হব । কেননা শক্রপাশের লরি ছাড়া সাধারণ লরি তো আমাদের চাপ্পা দিতে আসবে না । ”

“কত নম্বর বললে ? ডুরু বি. কে. ২০৮ ?”

“হ্যাঁ ।”

ফাঁকা রাত্তা পেয়ে ট্যাঙ্কি পড়ের গতিতে উড়ে চলল । কিন্তু খানিক যাওয়ার পরই ওরা বুঝতে পারল, বিপদ ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে । হয়তো বড়গাছিয়াতেই বাজারের আশপাশে কোথাও লরিটা দাঁড় করানো ছিল । তাই ওরা এগিয়ে যেতেই ভীষণ বেগে পিছু নিল ওদের । বড়গাছিয়া থেকে ডোমজুড়ের মাঝামাঝি মাইনের পর মাইল যে দক্ষিণবাড়ির মাঠ, সেখানে চিৎকার দূরের কথা, কামান গর্জালেও সেই শব্দ কারও কানে পৌঁছবে না । দুর্ঘটনা ঘটানোর পক্ষে এইটাই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা । ওরা যত জোরে ট্যাঙ্কিটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, তার চেয়েও ভীষণ বেগে লরিটা ধাওয়া করে ওদের । দুটো আগনের চোখ নিয়ে যেন একটা যত্নদানব আগামী আক্রমণে থেয়ে আসছে ওদের দিকে ।

ড্রাইভারের নাম মদন । বলল, “তোমাদের ধারণাই ঠিক দেখছি । এখন যা অবস্থা তাতে এর হাত থেকে পরিআণ নেই । তবু তোমরা একটু সাবধানে ধরে বসে থাকো । আমি আরও জোরে গিয়ে হঠাতে স্পিড কমিয়েই একটা ধন-মাঠে নামিয়ে দেব ট্যাঙ্কিটাকে । তাতে হয়তো গাড়ির একটু ক্ষতি হবে, আর নিজেরাও চোট পাব খুব । তবু একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচব । ” কথা বলতে-বলতেই ড্রাইভার আচমকা ট্যাঙ্কিটাকে পাশেরই একটা কলাবনের মধ্যে চুকিয়ে দিল ।

প্রবল একটা বাঁকানি থেয়ে ট্যাঙ্কিটা যখন থামল তখন বুকের রক্ত যেন মুখে উঠে এল সবার । আচমকা ব্রেক ক্যান্ড ধকলটা সামলাতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওদের । চারদিকে তখন অক্ষকার ঘূটঘূট করছে ।

৬০

তারই মাঝে জোনাকি ও বিবিপোকার ডাক কানে যেন তালা ধরিয়ে দিল । বাবলুরা এক-এক করে বেরিয়ে এল সবাই । তবে সহশক্তি বটে পঞ্চের । একবার শুধু গা-ঝাড় দিয়ে শরীরটাকে টান করে নিল । তারপর ডেকে উঠল, “ভো-ও-ও-ও ।”

এদিকে হয়েছে কী, লরিটা ওপে ধাকা দিতে গিয়ে নিজেই উলটে কাত । আসলে বাবলুরের ট্যাঙ্কিটা আচমকা কলাবনে ঢুকে যাওয়ায় হতভম্ব ড্রাইভার মুহূর্তের জন্য অনামনিক হয়ে পড়ল । ফলে বাস্পারে লাফিয়ে ছিটকে পড়ল পাশের বানখেতে ।

বাবলুর ছুটে গিয়ে দেখল ড্রাইভার এবং তার পাশে বসা একজন লোক উর্ধ্বনেত্রে কাত হয়ে আছে । দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড আঘাতে হাঁটফেল করেছে তারা । লরির মালপত্র সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে । এরই মাঝে কেউ যেন একটু নড়তড় করেছে মনে হল । বাবলু টর্চের আলো ফেলেই দেখল আকাশের চাঁদ । হাত-পা বাঁধা একটি মেয়ে । যার নাম কেম্বা ।

বাচু, বিচু গিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল তার । দিলে কী হবে । লরি থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে যে আঘাত সে পেয়েছে তাতে আর উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই তার । উত্তেজনায়, ভয়ে সে কাঁপছে ।

বিলু আর ভোঝল পাশের একটি জলশয় থেকে জল এনে চোখে-মুখে দিতে লাগল ওর ।

বাবলু ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে সবুজ কচি ঘাসের ওপর শোওয়াল ।

খানিক পরে একটু প্রকৃতিশু হয়ে কেয়া বলল, “আমি কোথায় ?”

বাচু বলল, “তুমি আমাদের কাছে । আমরা দক্ষিণবাড়ির মাঠে পড়ে আছি ।”

বাবলু বলল, “তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?”

“না । তবে হাত-পাণ্ডলো কেমন যেন কাঁপছে । ধড়ফড় করেছে বুকের ভেতরটা । কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা লাগছে শরীরে ।”

“কী ভাগ্যে মাথা ফাটেনি বা হাত-পা ভাঙেনি । আসলে

৬১

মালপ্রণালোই তোমাকে বাঁচিয়েছে । ”

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চ 'ভৌ-ভৌ' করে তাড়া করল একজনকে । বাবলুরাও ছুটল পঞ্চুর পিছু-পিছু । দেখল, একজন লোক খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বড় রাস্তার দিকে ছুটছে । বাবলু চিন্কার করে বলল, “হ্যাঁ । ”

লোকটি ঘুরে দাঁড়াল । ওর হাতে বিভন্নভাব । বলল, “খবরদার । এক পা এগোলে শুলি করব । ”

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকটি কুকুর কোথা থেকে যেন ছুটে এসে বাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চুর ওপর । একসঙ্গে এত আক্রমণে ধরাশায়ী হল পঞ্চু । তবু সে সমানে লড়ে যেতে লাগল ওদের সঙ্গে । ওঁ, সে কী ভীষণ মারামারি !

বাবলু লোকটিকে পিণ্ডল দেখিয়ে বলল, “পালাবার চেষ্টা করবেন না । আপনার শুলির উন্নত কিন্তু আমরাও শুলি নিয়েই দেব । ”

“ওই খেলনা পিণ্ডলের শুলি আমার জামাও ফুটো করতে পারবে না ভাই । ”

বাবলু বলল, “তবে রে ?” বলেই পিণ্ডল উচিয়ে লোকটির পায়ের দিকে লঞ্চ করে ত্রিপারটা টিপে দিল ।

‘খট’ করে একটা শব্দ হল শুধু । এ ছাড়া আর কিছুই হল না ।

লোকটি হো-হো করে হেসে বলল, “কী হল ! মারো ? ”

বাবলু মাথা হেঁট করল ।

বিলু আর ভোম্বল এগোতে যাচ্ছিল । বাবলুই বারণ করল ওদের । কেননা লোকটা বেশ কিছুটা দূরহো আছে । ওরা যাওয়ার চেষ্টা করলেই হয়তো শুলি চালাবে । তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেই চলে যেতে দিল লোকটাকে । বাবলুর চোখে যেন জল এসে গেল । এমন তো হওয়ার কথা নয় । আসলে এটা বাচ্চ নিয়ে এসেছিল ওদের বাড়ি থেকে । তাড়াতাড়ির মাথায় ওর হয়তো মনে ছিল না যে, এটা নিলেই এর ভেতরের জিনিসটাও নিতে হয় ।

লোকটি চলে গেলে বাবলুর পঞ্চুকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল । বরাবর পঞ্চুই ওদের সাহায্য করবে আর ওরা কেউ কিছু করবে না, ৬২

তা তো নয় । ততক্ষণে অবশ্য কয়েকটা কুকুর পঞ্চুর বীরবিক্রমের কাছে হার মেনে রাখে ভঙ্গ দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঘেউ-ঘেউ করছে । কিন্তু দুটো কুকুর তখনও সমানে লড়ে যাচ্ছে পঞ্চুর সঙ্গে । বাবলুরা গিয়ে হাতের সামনে যা পেল তাই ছুড়ে ছটচাট করে তাড়া দিতেই পালাল কুকুরগুলো । পঞ্চু তখন থরথর করে কাঁপছে ।

বাবলু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে আবার ফিরে এল সেই দুর্ঘটনাহুলোর কাছে । কেয়া তখন বাচ্চুর কাঁধে মাথা রেখে বিঙ্গুর কোলে হাত দিয়ে বসে আছে ।

বাবলু গিয়ে বলল, “হ্যাঁ, এইবার বলো তো দুপুর থেকে ঘটনাটা কী হল ? আর কেমন করেই বা এদের খলের পড়লে তুমি ? ”

কেয়া বলল, “তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আমি তো ফিরে আসছিলাম । বাস থেকে নেমেই দেখি ভুলুকাকা দু'জন লোককে নিয়ে মাটের ওপর দিয়ে হস্তদন্ত হয়ে আসছে । ”

“ভুলুকাকা মানে ভুলু মণ্ডল ? ”

“হ্যাঁ । তা আমাকে দেখেই বলে উঠল, ওই তো এসে গেছে । ”

আমি তখন থমকে দাঁড়িয়েছি ।

ভুলুকাকা বলল, “কী রে ! কোথায় ছিল এতক্ষণ ? একটু আগেই কে যেন বলল তুই বড়গেছে স্টেশনে বসে কাদের সঙ্গে যেন গল্প করছিস ? এদিকে তোর বাড়ির খবর জানিস ? ”

আমি ভয় পেয়ে বললাম, “কই ন-না তো । কী হয়েছে কাকা ? ”

ভুলু মণ্ডল অত্যন্ত বাজে লোক । তবু এই মুহূর্তে ওকে কিন্তু সেরকম মনে হল না ।

“তোর মাকে সাপে কামড়েছে । বিষাক্ত সাপ । ”

“সে কী !” আমার দু' চোখ তখন জলে ভরে এল । আমি যেই না ছুটে বাড়ির দিকে যাব তখনই ভুলুকাকা বলল, “যাচ্ছিস কোথায় ? আয় আমার সঙ্গে । এদিকে একজন ভাল রোজা আছে আমি কথা বলিয়ে দেব তার সঙ্গে । তুই তাকে বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে যা । কেননা আমরা এখনি কলকাতা যাব । আমাদের হাতে একটুও সময় নেই । ”

“কী যে হল আমার ! ওকে বিশ্বাস করে চললাম ওদের সঙ্গে ।

তারপর যেই একটু এসেছি অমনই ওর সঙ্গের লোক দুজন ঝাঁপিয়ে  
পড়ল আমার ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে তুলল কিছু  
বুঝতে পারলাম না। এর পর আমার হাত-পা বেধে ফেলে রাখল একটা  
বড় ঘরে। আর বারবার জিজেস করতে লাগল বড়গাছিয়া স্টেশনে বসে  
তোমাদের আমি কী কথা বলেছি। ওরা কীভাবে যেন জানতে পেরেছে  
তোমরা সাধারণ ছেলেমেয়ে নও। তোমরা অতি মারাখক। যাই হোক,  
আমার কাছ থেকে যখন কোনওভাবেই কথা আদায় করতে পারল না,  
তখন ঠিক হল আমাকে মেরে পুঁতে দেবে ওরা। তা ভুলুকাকা বলল,  
“খুন-খারাপির দরকার নেই। আপাতত ওকে বজবজে নিয়ে চলো।  
তারপর ‘বস’ যা বলবে তাই হবে।”

“ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম বস নাকি আমাকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম  
দিয়েছে। আর মেরে ফেলবার আদেশ দিয়েছে তোমাদের। ওরা  
অনেকক্ষণ থেকেই নজরে রেখেছিল তোমাদের। সঙ্গের পর একটা জরি  
ঠিক করে সেই লরিতে নানারকম জিনিসপত্রের মাঝাখানে কার্টন বক্সের  
আড়ালে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল ওরা। তারপর তোমাদের রাস্তায়  
পেয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভাগ্য ভাল যে, বেঁচে গেছ  
তোমরা।”

বাবলু বলল, “আসলে আমরা যে তোমাদের গ্রামে গেছি বা কী  
করেছি না করেছি সবই দেখছি নজরে রেখেছিল ভুলুর লোকেরা।”

“তোমরা কি আমার বাড়িতে গিয়েছিলে ? আমার মা, বাবা কানাকাটি  
করছেন খুব ?”

“জানি না। তোমার বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে দু-দুটো  
খুন হয়ে গেছে জানো কী ?”

“খুন !”

“হ্যাঁ। অস্বিকাবাবু আর ভজহরির লাশ বোধ হয় এখন পুলিশ মর্গে।  
নায়েব চৌধুরীর মুখে সব শুনে আমরা তোমাকে ও সংযুক্তকে উদ্ধার  
করব বলে বজবজের দিকে যাচ্ছিলাম। ভাগ্য ভাল যে, পথেই পেয়ে  
গেলাম তোমাকে। এখন ওকে কোনওরকমে উদ্ধার করতে পারলেই  
আমাদের ছুটি।”

৬৪

এমন সময় ট্যাঙ্কি-ড্রাইভার মদন ওদের কাছে এসে বলল, “আরে !  
তোমরা এইখানে ? আমি এতক্ষণ কত খুজছি তোমাদের। শোনো,  
আমার ট্যাঙ্কি খারাপ হয়ে গেছে। ওটা আর যাবে না। আমি বহু কষ্টে  
অন্য একটা ট্যাঙ্কি জোগাড় করেছি। তোমরা ওতে করেই বাড়ি চলে  
যাও। যাওয়ার সময় ডোমজুড় থানায় একটু খবর দিয়ে যেয়ো। আর  
এই নাও তোমাদের টাকা।”

বাবলুও নেবে না। ড্রাইভারও ছাড়বে না।

বাবলু বলল, “আপনি ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন দাদা।  
মাঝারাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। আপনার তো এখন টাকার  
দরকার।” বলে ওরা নতুন ট্যাঙ্কিতে চেপে ডোমজুড় এল। তারপর  
ধানায় খবর দিয়ে বাড়ি চলে এল সে-রাতে। আজ আর কোনও  
অভিযান নয়। শুধু বিশ্রাম—বিশ্রাম—আর বিশ্রাম।

সে-রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে পরদিন সকালে সবাই একজেটি হল  
আধাৰ। ডাঙ্গোর এসে প্রত্যেককে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে গেলেন।  
কেয়ার আধাতটাই সবচেয়ে বেশি। ভগৱান বৰঞ্চ করেছেন তাই। না  
হলে এই অবস্থায় গুরুতর জখম না হয়ে কেউ অক্ষত থাকে না।

সকালের ব্রেকফাস্টটা মন্দ হল না। গাজুরের হালুয়া, লুচি, চা। তার  
ওপরে একটা করে কলা আর ডিম সেদ্ব।

খেতে-খেতেই বিচ্ছু বলল, “তা এখন আমাদের করণীয় কী ?”

বাবলু বলল, “শ্যাতানের ঘাসিতে হানা দেওয়া। অবশ্য লাভ কতটুকু  
হবে তা জানি না। কারণ, যে-লোকটা কাল একটুর জন্মে ফসকে  
পালাল সে কি ওদের ‘বস’কে গিয়ে সব কথা বলবে না ভেবেছিস ? আর  
বলা মানেই সতর্ক হয়ে যাওয়া। ওরা তাই গেছে। এখন সংযুক্তার  
খৌজ পাওয়াই দায়।”

কেয়া বলল, “যে-লোকটার কথা বলছ তোমরা, ওই তো ভুলু  
মশুল। নেহাত তোমরা এসে পড়েছিলে আর কুকুরটা ছিল তাই  
পালাচ্ছিল। না হলে কি আমাকে ছেড়ে যেত ভেবেছ ? অবশ্য ওরও  
লেগেছে খুব।”

৬৫

বিলু বলল, “বৌড়াছিল তো !”

বাবলু বলল, “সে যাক । ওদের ঠিকানাটি যখন পেয়ে গেছি তখন আর কোনও অসুবিধে নেই । শেষ চেষ্টা একবার করে দেববই ।”

ভোষ্বল বলল, “কথন যাবি ?”

“কথন আবার ? এখনই ।”

কেয়া আবদার করে বলল, “আমিও যাব গো তোমাদের সঙ্গে ?”

বাবলু বলল, “না । তার কারণ অথমত, আলাদিনের অশ্চর্য প্রদীপের মতো তোমাকে আমরা উদ্ধার করেছি । দ্বিতীয়ত, আমাদের কাজের ধারার সঙ্গে তুমি পরিচিত নও । বাচ্চু, বিচ্ছু মেয়ে হলেও দরকারে মেরে ফাটিয়ে দিতে পারে । সীতার কটায় ভোষ্বলের জুড়ি নেই । বিলুর এক অশ্চর্য করতা । সে হাঁটাঁ লাফিয়ে উঠে পায়ের হাঁটুর খাঁজে এমন লাথি মারে যে, অনেক আচ্ছা-আচ্ছা গুণ্ডা-মস্তানও কাবু হয়ে যায় । আমি নিজে লাইসেন্সযুক্ত পিস্টল ব্যবহার করি । যেটা পুলিশ থেকেই দিয়ে রেখেছে আমাকে । আমার ঘুসির জোরও বড় কম নয় । সেগানে তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ ।”

কেয়া বলল, “তবু আমি যাব ।”

“তুমি আজকের দিনটা এখানেই বিশ্রাম করো । নয়তো বাড়ি ফিরে যাও । তোমার বাড়ির লোকেরা কত ভাবছে । এখন খানা-পুলিশ হয়ে অবস্থাটা এমনই হয়েছে যে, তুমি এখন নির্ভয়ে যেতে পারো । কেউ তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে না । নায়েব চৌধুরীকে আমরা সবাই ভুল বুকেছিলাম । আমে গিয়ে ওঁকে একটা প্রণাম কোরো ।”

বাবলুর মা সব শুনে বললেন, “ও ঠিকই বলছে মা । তুমি ঘরে চলে যাও ।”

কেয়া বলল, “তাই যাব ।”

বাবলু বলল, “মনে দুঃখ করলে না তো ?”

“তাতে তোমার কী যায়-আসে ? তবে সংযুক্তর খৌজে যখন যাচ্ছ তখন আমাকেও সঙ্গে রাখলে পারতে । কারণ ও হয়তো তোমাদের বিশ্বাস নাও করতে পারে ।”

“শোনো, আমরা সংযুক্তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি এটাও যেমন ঠিক,

তেমনই আমরা যাচ্ছি এক পেশাদার খুনি ও কুখ্যাত শয়তানের মোকাবিলা করতে ।”

“কে সে ? ভুলু মণ্ডল ?”

“না । সাইমন জাভেরি ।”

নামটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই কেয়ার মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল ।

বাবলু আরও বলল, “এই সাইমন জাভেরির শেন্দুষ্টির মুখে তোমাকে আমরা কী করে নিয়ে যাব ? ভুলে যেয়ো না কাল রাত্রি পর্যন্ত তুমি তারই শিকার ছিলে ।”

অবাক বিশ্বায়ে কেয়া বলল, “সাইমন জাভেরি ! কী বলছ তোমরা !”

“এ নাম শুনেছ তুমি ?”

“শুনেছি । সংযুক্তর মুখেই শুনেছি একবার । ও নাকি অতি ভয়ঙ্কর ।”

বাবলু বলল, “ঠিক সেই কারণেই আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি না ।”

কেয়া বাবলুর মাকে বলল, “আপনি যেভাবেই হোক, বাবলুদাকে আটকান । সাইমনের ডেয়ার ওদের কিছুতেই যেতে দেবেন না । গেলে কিন্তু ফিরবে না কেউ ।”

মা বললেন, “কী বলব বলো মা আমি ।”

বাবলু বলল, “কেন, তুমি কি চাও না তোমার বাস্তু মুক্তি পাক ? সাইমন জাভেরির মুখোয়াবি না হলে ওকে আমরা পাব ক্ষেত্রে ?”

“একজনের জন্মে তোমরা সবাই মরবে ?”

“এই কাজের জন্মেই যে আমরা ।”

“বেশ । তা হলে তোমরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না । তোমার মায়ের কাছেই থাকব আমি । তবে আমার বাড়িতে বরাং কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কোরো ।”

বাবলু বলল, “সে-ব্যবস্থা আমি করছি । থানায় ফেল করলে থানা থেকেই খবর দেবে ।” বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলল বাবলু ।

তারপর ফোনে কথাবার্তা বলে ওরা যখন সদলবলে রওনা হল,

কেয়ার চোখ দুটো তখন ছলছল করছে। কিন্তু করলে কী হবে? ওকে নিয়ে যাওয়ার ঝুকি তো নেওয়া যায় না। উচিতও হবে না।

॥ ৭ ॥

হাওড়া স্টেশনে এসে ওরা কোনদিক দিয়ে এবং কীভাবে বজবজে যাওয়া যায়, সেই বাপারেই আলোচনা করতে লাগল। লক্ষ্মে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে বাবুঘাট থেকেও মিনিবাসে বজবজ যাওয়া যায়। আবার শিয়ালদহ থেকে ট্রেনও আছে। আর-একটা পথ আছে, সেটি হল হাওড়া থেকে ট্রেনে বাটুরিয়া। এবং সেখানে ভটভটি নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে বজবজ। ওখান থেকে চড়িয়াল বাজার খুব জোর দশ মিনিটের পথ। পাশৰ গোয়েন্দারা এই পথটাই ওদের সুবিধের জন্য বেছে নিল। তার কারণ, শক্রপক্ষের কেউ যদি ওদের দিকে নজরদারি করবার কথা ভাবে তা হলে স্বাভাবিকভাবেই এই দিকটাকে এড়িয়ে যাবে তারা। এই ভেবেই ওরা বাড়িয়ার টিকিট কেটে ট্রেনে চাপল। তারপর দুপুর নাগাদ পৌছে গেল বজবজে।

এখন প্রশ্ন হল, ওই ঘোটিতে হানা দেওয়া যায় কীভাবে? চড়িয়াল বাজারে যাওয়ার আগে গঙ্গার ধারে বসেই আলোচনাটা সেবে নিল ওরা। পাশৰ গোয়েন্দারা যে এই বাপারে মাথা যামাছে, শক্রপক্ষ তা জেনে গেছে। আর তিনিটি ছেলে, দুটি মেয়ে এবং সঙ্গে একটি কালো কুকুর দেখলে যে-কেউ বুঝবে ওরা কারা। অতএব একসঙ্গে ওদিকে কখনওই যাওয়া নয়।

ওরা তাই পরম্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলল। ঠিক হল বাবলু একাই শক্রবৃহে হানা দেবে। আর বাইরে থেকে দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে বাড়িটার দিকে নজর রাখবে বিলু ভোদ্বল, বাচ্চ, বিচ্ছু। এবং পঞ্চ ধোরাফেরা করবে স্বাভাবিকভাবে। যাতে সবাই ভাবে গুটা একটা রাস্তার কুকুর ছাড়া কিছু নয়।

সময়টা সঙ্গের পর হলে কোনও অসুবিধে হত না। কিন্তু সবে দুপুর গড়িয়েছে। কাজেই এখন থেকে সঙ্গে পর্যন্ত অপেক্ষা করবার মতো ধৈর্যও ওদের নেই। তার কারণ, দু-দুটো খুনের পর পুলিশের হাতে ধরা

পড়বার জন্য সাইমন নিশ্চয়ই এখনও ঘরের ভেতর বসে থাকবে না। আর পাশৰ গোয়েন্দারের অভিযান সফল করবার জন্য ভুলু মণ্ডলও অপেক্ষা করবে না এখানে। তবু আসা। যদি ওরা সংযুক্ত উকারের ক্ষীণ সূত্রও এতটুকু খুঁজে পায় ওদের এই গোপন ডেরায়।

চড়িয়াল বাজারের একটা ছোট্ট গলির ভেতর ঠিকানাটা। কোনও ভুদ্বলকের বাস নেই এখানে। ওদের সকলকে পরিকল্পনামতো কাজ করতে বলে বাবলু একাই চুকে পড়ল গলির ভেতর। তারপর ঠিকানা মিলিয়ে যখন সেই বাড়িটার কাছে এল তখন দেখল দরজায় একটা তালা ঝুলছে। তার মানেই পারি ঝুড়ত।

বাড়িটা বহুদিনের পুরানো। এবং দোতলা। ভোম্বলকে কাজে লাগানৈ দরজাটা ও খুলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে রাস্তার লোকেদের চোখে পড়বার ভয়। তা ছাড়া...। হঠাতে বাড়ির পাশের একটি নর্দমার গাড়ে আর-একজনদের বাড়ির ভাঙা পাটিলের ওপর গজিয়ে ওঠা একটা বটগাছের শেকড় ঝুলতে দেখল বাবলু। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, এটা ধরে ওপরে উঠলেও বারান্দার নাগাল পাবে। আর সেখানে পৌছতে পারলে তো কোনও চিন্তাই নেই। তাই একটুও সময় নষ্ট না করে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে দেখে সেই শেকড় ধরে পাটিলে পা রেখে উঠে এল বারান্দায়। তারপর রেলিং ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল চোখের আড়ালে। পিস্টনটা ঠিক জায়গায় আছে কি না একবার দেখে নিল। নাইলনের একটা আংটা-লাগানো ফিতেও আছে পকেটের মধ্যে। আর কিসের ভয়? ও পা টিপে-টিপে ওপরের ঘরণগুলো এক-এক করে চুকে দেখল। কোনও ঘরে কোনও কিছুই নেই। শুধু শোওয়ার মতো বিছানাপন্থর ছাড়া। একটি ঘরে শুধু তালা লাগানো। সেই ঘরে কী আছে কে জানে? বাবলু অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রাইল সেই দরজায়। তারপর বেড়ালের মতো সন্তুষ্পণে নেমে এল নীচে। সিঁড়ির পাশেই আর-একটি ঘর আছে। সেই ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের ভেতর চুকেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল বাবলু। দেখল, মুখে বসন্তের দাগ, কপালের পাশে সাদা দাগ। কে যেন একজন টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘূরিয়ে আছে। কেমন যেন সদেহ হল বাবলুর।

গায়ে হাত দিয়ে দেখল উত্তাপহীন দেহ। অর্থাৎ অনেক আগেই মারা গেছে লোকটা। বর্ণনা অনুযায়ী ইনিই ভুল মণ্ডল। ভুল মণ্ডলের হাতে একটা চিঠি ছিল। চিঠিটা এইরকম, 'আমার কাজ শেষ। আমি চললাম। এখন আমি আলফানসো আলবুকার্কের দলে যোগ দিতে যাচ্ছি। মেয়েটাকেও সঙ্গে নিলাম। আর দু-এক বছর বাদে ও আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তোমার টাকাগুলো আমার কাছেই আছে। আমাকে সেইমান বা বিশ্বাসযাতক ভেবো না। শুধু মনে কোরো, তোমার এই বক্সটিকে তুমি এগুলো গিফ্ট দিয়েছে। সামান্য দশ লাখ টাকা বই তো নর। ওতে কীই-বা হবে তোমার ?'

বাবলু বুলুল সর্বস্বান্ত ভুল মণ্ডলের এই চিঠি পড়েই স্ট্রোক হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাইরেরদেরজায়তা হলে তালা দিল কে ? এক হতে পারে, এ-বাড়ির কোনও কাজের লোক, দরোয়ান হ্যাতো বাইরে ছিল। এসে ভুলুর অবস্থা দেখেই সবে পড়েছে। সে যাই হোক, এখন সমস্যার পর সমস্যা এসে হাজির হল। সংযুক্তকে উদ্ধার করবার ক্ষীণ আলোটুকুও নিভে গেল। সাইমন জাভেরির দেখা পাওয়ার আগেই আর-একজনের পদবন্ধন শোনা গেল। কে এই আলফানসো আলবুকার্ক ? কোথায় থাকে সে ? সাইমন সংযুক্তকে নিয়ে কোথায় চলে গেল ? সে দেশ কোথায় ? কত দূরে ?

বাবলুর সব যেন কীরকম গুলিয়ে যেতে লাগল। ও আর একটুও দেরি না করে শুরু করল অনুসন্ধান। যেখানে যা পেল গুটিয়ে দেখতে লাগল। এককোণে একটা লোহার রেশ পড়ে ছিল, ও সেটা নিয়ে সোজা উঠে গেল ওপরের ঘরে। যে-য়ারে তালা দেওয়া ছিল সেই ঘরের তালায় রেঞ্জের বাড়ি দু-এক ঘা দিতেই, পুরনো দরজার তালা শিকলসুন্দু ভেঙে পড়ল। ঘরে চুকেও আশা পূর্ণ হল না বাবলু। এ-ঘরেও একটি খাট, বিছানা ছাড়া কিছুই নেই। ঘরের দেওয়ালে যিশুর একটি ছবি আছে। এইটাই কি সাইমনের ঘর ? তাই যদি হয় তা হলে এই ঘরেই বা তালা দেওয়া কেন ? না কি অভ্যাসবশে দিয়ে গেছে তালাটা ? ঘরের ডেতর টেবিলের ওপর একরাশ কাগজপত্র। কত চিঠি। সবই এক-এক করে দেখতে লাগল বাবলু। এর মধ্যে হঠাৎ একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল

ও। চিঠিটা হিন্দিতে লেখা যদিও, তার অর্থ এইরকম—'আলফানসো আলবুকার্ক তোমাকে দলে পেতে চায়। পানিবাল ধর্মশালায় রাত একটায় দেখা হতে পারে। মেয়েটাকেও নিয়ে এসো। ছবি পছন্দ হয়েছে। উপর্যুক্ত দাম পাবে। — সাহজি, রামটেক।'

বাবলুর মাথাটা খিমখিম করতে লাগল। আর বোধ হয় উদ্ধার করতে পারল না মেয়েটাকে। অতল জলের আহানে কোথায় যে তলিয়ে যাবে সে, কে জানে ? আলফানসো আলবুকার্ক নামের কাউকে হ্যাতো ফোটো পাঠিয়েছিল সংযুক্তর। সেই ছবি পছন্দ হয়েছে আলবুকার্কে। তাই মেয়েটাকে সে কিনে নিতে চায়। সেইসঙ্গে দলে রাখতে চায় সাইমন জাভেরির মতো ধড়িবাজকে।

শুনা যাচায় আর না থেকে বাবলু যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই এল বাইরের গলিতে। বিলু, ভোলু দূর থেকে নজর রাখছিল। তাই বাচ্চ, বিচ্ছুকেও ইশ্বারায় ডেকে পঞ্চকে নিয়ে চলে এল বড় রাস্তায়।

বিলু বলল, "কী রে ! কিছু বুবলি ?"

"নাঃ। পাচার হয়ে গেছে মেয়েটা।"

"এখন তা হলে ?"

"পুলিশে একটা খবর দিয়ে বাড়ি ফেরা যাক।"

"পুলিশে কী খবর দিবি ?"

"খবর দেব এই যে, এই বাড়িরই একটি ঘরে ভুল মণ্ডলের লাশ আছে। না নিয়ে গেলে পচে গুরু ছাড়বে।"

ওরা আরও কিছু শোনবার আশায় বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। বাবলু বলল, "এখানে আর কিছু জানতে চাইবি না। যা বলবার সব বাড়ি গিয়ে বলব।" ওরা প্রথমেই একটা পাবলিক টেলিফোনে কথা বলল। বাড়িতে একটা ফোন করে, পুলিশে খবর দিয়ে ভাল একটা মিটিং দোকান দেখে যাবার বেতে চুকল। সেই কথন দুটো থেয়ে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। এবার একটু কিছু-না বেলেই নয়। আর এখানকার মিটিংম সত্ত্বাই ভাল।

তোধিল বলল, "এইসব মিটিং দোকান দেখে আমার কিন্তু অনেকক্ষণ থেবেই লোভ হচ্ছিল। মিটিং তো খাবই সেইসঙ্গে গরম-গরম কড়াইভুটির

কচুরি কিন্তু খান দশকে থাব আমি।”

বাবলু বলল, “পারলে থা। তবে অধিক ভোজন আর রান্ধুসে খাওয়া—দুটোর একটাও কিন্তু ভাল নয়।”

ভোধল দেকানের ছেন্টিকে ডেকে বলল, “আমাকে দশটা কচুরি আর গোটা চারেক অমৃতি অবশ্যই দেবে। তারপর এরা যে যা খেতে চাইবে তাই। আর মিষ্টি দেবে যতরকম আছে।”

বাচ্চু বলল, “কী হচ্ছে কী?”

বিলু বলল, “খেয়ে হজম করতে পারবি?”

ভোধল হৈকে বলল, “আর শোনো, একশো গ্রাম দই। না, না। আড়াইশো গ্রাম। একশো দইতে আমার কী হবে?”

ভোধলের চাহিদামতো ছেন্টি সবই এনে দিল। তারপর বাবলুকে বলল, “আপনাকে কী দেব?”

বাবলু শুধু বলল, “শুধু এক গেলাস জল।”

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা বজবজ মিনিতে চেপে ধর্মতলায় এল। তারপর হাওড়ার বাসে মল্লিকফটকে নেমে যখন বাঢ়ি এল, রাত তখন দশটা। মা তখনও ওদের জন্য জেগে রাসে আছেন। আর কেয়া মেয়েটি মায়ের বিছানায় দু’ চোখ বুজে ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে।

ভোরে ওঠা মাথায় উঠল। বাবলুরই ঘূর্ম ভাঙল বেলা আটটায়। হবে নাই-বা কেন? যা ধুকল গেল দু’ দিন। বিলু, ভোধল, বাচ্চু, বিলু এলে সব কথা খুলে বলল বাবলু। এমনকী সেই চিঠিটাও দেখাল।

সাইমন জাভেরির চিঠি দেখেই তো কেয়ার চক্ষুহির। বলল, “এ কার চিঠি?”

“সাইমনের।”

“সে একজন আংলো ইভিয়ান। বাংলায় সে চিঠি লিখবে কী করে? এ তো মৈনাকদার হাতের লেখা।”

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, “মৈনাক চৌধুরীর?”

“হাঁ।”

“হতে পারে। এই চিঠি হ্যাতো মৈনাককে দিয়েই লিখিয়েছে সে।”

কেয়া বলল, “দ্যাখো বাবলুনা, আমি কিন্তু এখনও বলছি তোমরা সাবধান হও। ওই নায়ের চৌধুরীর কথায় একদম বিশ্বাস কোরো না। ওই লোকটা...।”

বাবলু বলল, “স্টপ। ওর সম্বন্ধে কোনওরকম বাজে কথা বোলো না। উনি যদি ছলনা করতেন আমাদের সঙ্গে, তা হলে কখনওই বজবজের ঠিকানটা দিতেন না। এখন আমরা শেষ চেষ্টা করব একবার রামটকে গিয়ে। তারপর সংযুক্তির খৌজে যদি আন্দামানেও যেতে হয় তাই যাব। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাব আমরা।”

কেয়া বলল, “তোমরা রামটকে গেলে আমিও থাব তোমাদের সঙ্গে।”

বাবলু বলল, “তুমি এখন বাঢ়ি যাবে।”

“আমি একবার তোমাদের কথা শুনেছি। আর শুনব না।”

“কিন্তু তুমি কেন বুবছ না আমাদের জীবনের কোনও দাম নেই।”

“আমি সবই বুঝি। আর এও বুঝি গ্রামের মেয়ে বলেই তোমরা আমার ওপর ডরসা করতে পারো না। তবে জেনে রাখো বাবলুনা, শ্বার্টনেস আমার মধ্যেও কম নেই। তা যদি না থাকত তা হলে তোমাদের ডাকে এককথায়...”

বাবলু বলল, “তুমি আমাদের তুল বুঝলে কেয়া?”

“তুল বোঝাবুঝির কিছু নেই। সংযুক্তির ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আমারও আছে। আচ্ছা, গুড বাই। আমি তা হলে আসি?”

বাচ্চু বিলু বলল, “কোথায় যাবে?”

“আপাতত বাঢ়ি যাব, আমার বাবা-মায়ের কাছে। এখন তোমরা দয়া করে আমার হাতে দশটা টাকা দাও। না হলে গাড়িভাড়ির পয়সা নেই। বাঢ়ি যেতে পারব না।”

বাবলু পঞ্চাশ টাকা ওর হাতে দিতেই ফৌস করে উঠল কেয়া। বলল, “অনেক টাকা হয়েছে তোমাদের, না? আমার দশ টাকা প্রয়োজন, দশ টাকাই দেবে। এগারো টাকাও নয়।”

বাবলু তাই দিল। টাকাটা হাতে নিয়ে বাবলুর মাকে প্রণাম করে

কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে গটগটি করে বেরিয়ে গেল কেয়া। বাবলুর নির্দেশে বাচ্চু ছুটল ওকে বাসে তুলে দিতে।

ওরা ফিরে এলেই বাবলু বলল, “শোনো, তোমরা খুব শিগগির তৈরি হয়ে নাও। আজ আর সময় নেই। কালই আমরা রামটেক যাব। আমাদের আগেই সাইমন হয়তো পৌছে যাবে সেখানে। পানিবাল ধর্মশালায় হানা দিলে ওদের আমরা পাবই। চাই কি আলফানসো আলবুকার্বের সঙ্গেও আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। এবার কিন্তু তুমুল লড়াই। যেভাবেই হোক, জয়লাভ আমাদের করতেই হবে।”

বিলু বলল, “আজ নয় কেন? আজই তো আমরা যেতে পারি।”

বাবলু বলল, “আমিও পারি। তবে কিনা রামটেক যেতে হলে আমাদের নামতে হবে নাগপুরে। নাগপুর যাওয়ার ভাল টেন মাত্র দুটি। এক হল বন্ধে মেল, অর-এক গীতাঞ্জলি। বন্ধে মেলে গেলে নাগপুর পৌছতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। অচেনা জায়গায় সেটা খুব কাজের নয়। তাই নাগপুর যাওয়ার পক্ষে দুপুরের গীতাঞ্জলিই ঠিক। পরদিন সকাল হাঁটায় নাগপুরে পৌছে দেয়। বন্ধে মেলে মাস দুই আগে থেকে চেষ্টা না করলে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে গ্রায় সব সময়ই পাওয়া যায়। আমি এখনই গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি। না পাই কাল বিনা রিজার্ভেশনেই চলে যাব। দেরি করা চলবে না।”

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, “কাল যাওয়াই ভাল। মাথা ঠাণ্ডা করে তবু সব বিছু ঠিকঠাক ঘুচিয়ে নিতে পারব।”

বাবলু বলল, “আমি তা হলে টিকিটের চেষ্টা দেখি?”

“নিশ্চয়ই।”

বাবলু সকলকে বিদায় দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে টিকিট কাটতে চলে গেল। হ্যাতো টিকিট পাবে না, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? তবে মোটামুটি স্থির হল কাল ওরা যাচ্ছেই।

বিকেলবেলা মিস্টারদের বাগানে সকলে জড়ো হল ওরা, তখন নতুন অভিযানের পক্ষে সবাই প্রায় মাতোয়ারা। বাবলুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। গীতাঞ্জলির ছি-টিয়ারে তিনটি বার্থ ও পেয়ে গেছে। বাবলু, বিলু ও

ভোম্বলের নামে। বাচ্চু, বিচ্ছুকে ওদেরই বার্থে তুলে নেবে। একটা রাত বই তো নয়। পালা করে জাগতে থাকলে কারও ঘুমেরই অসুবিধে হবে না।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, “বাবলুদা! রামটেক কি বিখ্যাত জায়গা? নামটা যেন খুব পরিচিত মনে হচ্ছে?”

বাবলু বলল, “নিশ্চয়ই বিখ্যাত জায়গা। ওর আর-এক নাম রামগিরি। কালিদাসের মেঘদূতের জন্যে এককালে বিখ্যাত ছিল।”

বিলু বলল, “সে আবার কী? এককালে ছিল, এখন নেই?”

বাবলু বলল, “এখনও আছে। তবে মেঘদূতের জন্যে নেই। উইলসন সাহেবের মতে, এই রামটেকই কালিদাসের রামগিরি পর্বত। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণায় ঠিক হয়েছে, এ-ধারণা ভুল। কালিদাসের রামগিরি আসলে সরঙ্গজা ডিস্ট্রিক্ট-এর রামগড়। যার নাম এখন ‘অমরকণ্ঠক’। তবে রামটেকও এখন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।”

“নাগপুর থেকে রামটেক কতদূরে?”

“বিশিন্দুর নয়। মাত্র সাতচালিশ কিলোমিটারের পথ।”

“ওখানে পাহাড় কি খুব বড়?”

“তা কী করে জানব বল? তবে শুনেছি নাকি চারদিকেই শুধু পাহাড়।”

“নাগপুর শহরও তো খুব উন্নত?”

“হ্যাঁ। ওখানকার লেবু বিখ্যাত। আগে তো নাগপুর মহারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এরও চারদিক পাহাড় দিয়ে যেো। উত্তরে সাতপুরা ও দক্ষিণে অঙ্গাগড়। এই অঙ্গাগড় পাহাড়েই রামটেক। আনেক মনির আছে। নাগপুর ছিল প্রাচীন বিদর্ভেও রাজধানী। নাগা নদীর তীরে অবস্থিত বলেই এই শহরের নাম নাগপুর। মধ্যযুগে এই নাগপুর ছিল গোও রাজ্যের অধীনে। এখন এক বিরাট শহর।”

ভোম্বল বলল, “নাগপুরে আমরা মোট ক'দিন থাকব?”

বাবলু বলল, “একদিনও না। তার কারণ, এটা আমাদের বেড়াতে যাওয়া নয়। এবারের অভিযান তদন্তের। ভাগ্য ভাল তাই রহস্যের জট গোড়াতেই খুলে গেছে। এখন শুধু উদ্ধার-পর্ব। আর কাজ সম্পূর্ণ

বিপজ্জনক। কেননা আমরা এখন বাধের মুখ থেকে তার শিকারকে ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছি। তার উপর শক্রও খুব শক্তিমান। তাও তারা দু'জন। সহিমন ও আলুকুর্কি।”

কথা বলতে-বলতেই সঙ্গে হয়ে এল। ওরা আগামী দিনের যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে ফিরে এল যে-যার।

॥ ৮ ॥

বেলা বারেটি পঞ্চতিশে হাতোড়া থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ছাড়বার কথা। ওরা তাই বারেটির মধ্যেই স্টেশনে চলে এল। এসেই দেখল ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। ওরা চার্টে নাম মিলিয়ে এস-সেভেন বগিতে গিয়ে চুকল। বাচ্চু, বিচ্ছুর রিজার্ভেশন ছিল না। তাই ওদের দুটো টিকিট কেটে আর্টেনডেন্টকে একটু জানিয়ে তুলে নিল ওদের বগিতে। পঞ্চ ওর নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ বার্থের নীচে শুয়ে রাখল চুপচাপ।

রাতের শোওয়ার ব্যাপারে ঠিক হল, নীচের মেবেয় শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে পড়বে ভেবিল। আর ওর বার্থটিতে এদিক-ওদিক করে শোবে বাচ্চু, বিচ্ছু। শুধু একটা রাত। সকাল হলেই তো নামা। তবু ভাল যে, তিনটে বার্থ পাওয়া গেছে। না হলে কী হত?

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, “কেয়া আসব বলল, এল না তো?”

বাবলু বলল, “ও পাগলির কথা ছেড়ে দে। সেই জগৎবল্লাভপুর থেকে হাতোড়ায় আসতে সময় লাগবে না? হয়তো দেরি করে ফেলেছে। এসে দেখবে ট্রেন আউট অব স্টেশন। যাক। এখন আমাদের কাজের কথা হোক।”

বিলু বলল, “কাল যেভাবে আমরা সহিমনের ঘাঁটি ধিরে ফেলেছিলাম তাতে ওরা পালিয়ে না গোলে সংযুক্ত উদ্ধার কালই হয়ে যেত।”

বাবলু বলল, “আমাদের এই অভিযানে প্রতি পদে বাধা এবাবে। তুলু মণ্ডলকেও আমরা যেভাবে হাতেনাতে ধরেছিলাম, তাতে পালিয়ে যাওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না ওর। পঞ্চকে আটকাল গোটাকতক তেজি কুকুর। আমার হাতে পিস্তল, অথচ শুলি নেই তাতে। এইভাবে সুযোগ

৭৬

নষ্ট আমাদের অভিযানে কথনও হয়নি। তুলু মণ্ডলকে হাতেনাতে ধরতে পারলে সংযুক্তার খবর তো পেতামই। সেইসঙ্গে সহিমনের সব খবর। আর কান ধরে টান দিলে যেমন মাথাটা আসে, তেমনই আলফানশো আলুকুর্কির বহসের জাল ছিড়ে বেরিয়ে আসত ‘আমাদের কাছে। এখনও যে কত দুর্ভেগ বাকি, তা কে জানে?’

গীতাঞ্জলি সুপার ফার্স্ট ট্রেন। তাই ডিঙ্গতিতে হুটতে লাগল হ-হ করে। দেখতে-দেখতে খড়াপুর এসে গোল। খড়াপুরে দু’ মিনিট থামল। তারপর আবার হুটতে লাগল ট্রেন।

একজন কফিয়োলা কফি নিয়ে এল।

বিলু বলল, “এককাপ করে কফি খেয়ে নিলে হত না?”

সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, “সেইসঙ্গে একটু করে কেক। ওঁ, কেক কিনতে গিয়ে আর-একটু হলেই হাতছাড়া করেছিলাম ট্রেনটাকে।”

বাবলু অবকাহ হয়ে বলল, “এ কী কেয়া! তুমি কোথেকে এলে?”

“কেন, বাড়ি থেকে। তোমরা আমাকে সঙ্গে নাও আর না নাও, আমি একাই যাব। ভাগ্যে তোমার মা ফোনে আমাকে বললেন।”

পাঞ্চব গোয়েন্দারা হতবাক।

কেয়া বলল, “স্টেশনে কত খুঁজলাম তোমাদের, পেলাম না। তাই সাহস করে উঠেই পড়লাম। এই গাড়ির ভেতরে-ভেতরে রাস্তা ছিল বলে খুঁজে পেলাম তোমাদের। প্রতিটি কামরা আমি তমতন্ত করে খুঁজতে-খুঁজতে আসছি।”

বাবলু বলল, “টিকিট কেটেছ?”

“না। চেকার এলে করে নেব।”

“তাতে কত ফাইন দিতে হবে জানো?”

“তা জানি বইলী। গ্রামের মেয়ে হলেও স্কুলে পড়ি। অতএব দেশের খবরও একটু-আধটু রাখি। আগে দশ টাকা ফাইন ছিল, এখন পঞ্চাশ টাকা হয়েছে।”

বাবলু বলল, “দাখো, পঞ্চাশ টাকা ফাইন দেওয়ার ক্ষমতা রাখাটা গোরবের নয়। বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপটা কিন্তু আপরাধের।”

“ওঁ। তাই বুঝি? এদিকে টিকিট কাটিতে গেলে ট্রেনটা যে ফেল

৭৭

কর্তাম সার।”

“তা হলে ঠিক আছে। পঞ্চাশ টাকা ফাইন দেওয়ার শুরুতা যখন আছে তখন শুধু-শুধু টিকিট কাটতে যাব কেন, এই মনোভাব রাখাটা ঠিক নয়।”

যাই হোক। ওরা কেক আর কফি খেয়ে চুটিয়ে গল্প করতে লাগল। একটু পরে চেকার এলে ফাইন দিয়ে টিকিটও কেটে নিল একটা। রাত নাট্টের সময় রাউটেরকেজ্জা এলে খাওয়ানাওয়া করে নিল সকলে। তারপর কেয়া, বাচ্চু, বিচ্ছু, তিনজনে তিনটে বার্থ দখল করল আর বাবলু, বিলু, ডেম্বল শুয়ে পড়ল নীচের মেঝেয়। পঞ্চ মীটিচেই রইল।

ট্রেনের দুর্বলিতে শোওয়ামাত্রই ধূমিয়ে পড়ল ওরা। মেই ধূম যখন ভালুক ট্রেন তখন নাগপুরে চুকচে। ফ্লাটফর্মে নেমে প্রথমেই ওয়েটিং রুমে গিয়ে মুখ-হাত ধূয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল ওরা। তারপর খানিক হেঁটে আসতেই পেরে গেল একটা খালি বাস। সরকারি বাস। পঞ্চুকে বাসে ওঠানোর ব্যাপারে কপুষ্টির একবার একটু শুইগাই করল বটে, পরে ওরও একটা টিকিট কাটতেই মেনে নিল। নাগপুর থেকে রামটকে পর্যন্ত বাসের ভাড়া নিল মাত্র পাঁচ টাকা বাট পয়সা। ঘটাখানেকের রাস্তা মাত্র। দ্রুতগামী বাস। ছেড়েই গতি নিল।

মস্ত শহর নাগপুর। যেমন ঘিঞ্চি তেমনই জমজমাট।

বাস থেকে নেমে একটা দোকানে বসে জলযোগ সেরে নিল ওরা। তারপর দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, “ভাই, এখানে থাকবার জায়গা কোনদিকে আছে?”

দোকানদার বলল, “ঠারনেকা জায়গা ইধার কাহা মিলি? পাহাড় পর চড়ে। মন্দির দর্শন করো। লছমন মন্দির, রাম মন্দির দেবো। উধারই ধরমশালা মিলেগা।”

পাহাড়ে ওঠার আনন্দে ওরা সবাই তখন অধীর। কত যাত্রী তো উঠছে। কেয়ার এই প্রথম পাহাড় দেখা। ও তো লাফাছে।

ওরা অন্য যাত্রীদের দেখে পর্বতারোহণ শুরু করল।

বাবলু বলল, “এই রামটকে দেখবুতের রামগিরি না হলেও দশনীয় জায়গা। বহু যাত্রী এখানে বারোমাস আসে। ভারী মনেরেম।”

৫৮

লাল পাথরের পাহাড়। ওরা ধাপে-ধাপে ওঠা শুরু করল। কত ছেট-ছেট ওহা ওদের চোখে পড়ল। তাৰ মধো দুটি ওহা ওদের খুব ভাল লাগল। একটি হল বাপটুরাম ওহা, অপৰটি সিকিনাথ। এ হাড়াও এই পর্বতের থাক্কতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। পাহাড়ের ওপৰ লছমন মন্দির, রাম মন্দির, হনুমান মন্দির, লছমিনারায়ণ মন্দির, কত মন্দির আছে। আৱ আছে মহাকবি কালিদাসের একটি মন্দির। রাম, লক্ষ্মণের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতেই বৃংঘি এই পাহাড়ের সর্বজ্ঞ যত হনুমানের রাজত্ব। প্রথমে তো তাৰা দারুণ বিৱৰণ কৰতে লাগল পঞ্চুকে। কেউ লেজ টেনে দিয়ে গাছে উঠে পড়ে। কেউ পিঠে চড়ে মজা দেখে। সে কী কাণ্ড! তারপর কক-কক করে ছুটে আসে কেয়াকে দেখে। অবশ্যে একজন পাণ্ডা এসে লাঠিপেটা কৰতে তবেই বাঁচোয়া।

পাহাড়ে উঠে ঝাল্ট, অবসন্ন দেহে অনেকক্ষণ বসে রইল ওরা।

বাবলু একজন পাণ্ডাকে দিয়ে জিজ্ঞেস কৰল, “আচ্ছা, এখানে থাকবার কী ব্যবস্থা কৰা যায় বলতে পারেন?”

পাণ্ডা ঠাকুর বললেন, “বাঙালি বাঙালি হাঁ।”

“তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই?”

“না। আমরা এই ক’জন।”

“ঠিক আছে। তালাওপুর চলা যাও।”

“তালাও কোন দিকে?”

“কিধুর সে আয়া তুম?”

বাবলু দেখিয়ে দিল। পাণ্ডা ঠাকুর বুবিয়ে দিলেন, এই পাহাড়ের দুটো দিক। একটা বাস থেকে নেমে খাড়াই ভেঙে ওপৰে ওঠা। আৱ-একটা বাস থেকে নেমে অটোয় তালাওয়ের দিকে চলে আসা। সেখানে রামসাগর তালাওয়ের পাশেই যাত্রীনিবাস। আগে এখানে অম্বরীশ ঝৰির আশ্রম ছিল। পাপঘূর্ণ অম্বরীশ নাকি ওই রামসাগরে মান কৰেই মোক্ষলাভ কৰেন। তীর্থযাত্রীরা ওই পথেই আসে।

পাণ্ডার দেখিয়ে দেওয়া পথ ধৰে পাণ্ডব গোয়েন্দাৱা নেমে চলল তালাওয়ের দিকে। পাহাড়ের ওপৰ থেকে তালাওয়ের (জলাশয়ের) যে

৫৯

নয়নমনোহর দৃশ্য ওরা দেখল, তরে তুলনা নেই। এইখানে এইরকম তিনটি জলাশয় আছে। নারায়ণ টিকরি, নাগার্জুন টিকরি, রামসাগর তালাও।

বাচ্চু বলল, “বাবলু, এইখানে থাকবে কয়েকটা দিন ? কী সুন্দর জায়গাটা। মনে হচ্ছে যেন কোনও এক অলকাপুরীতে চলে এসেছি।”

“আরে সেইজনোই তো লোকে প্রথমে একেই রামগিরি মনে করেছিল।”

ভোঞ্চল বলল, “আমি তো সাতার কেটে এই তালাওয়ের এপার-ওপার না করে ছাড়ব না।”

কেয়া বলল, “আমি শুধুই দেখব। দু’ চোখ ভরে দেখব। আমি তো কখনও কিছু দেখিনি। পাহাড় দেখিনি, ঘৰনা দেখিনি, নদী দেখিনি, অরণ্য দেখিনি। কিছুই দেখিনি। গ্রামে একটা নদী আছে। তবে সেটা নামেই নদী। আসলে একটা পচা খাল।”

বাবলু বলল, “সত্তি, কী শাস্তি নির্জন জায়গা। আমাদের অভিযান শেষ হোক, পরে একবার আমরা নতুন এনজি নিয়ে এখানে এসে দিনকতক থেকে যাব।”

ওরা পায়ে-পায়ে নীচে নামতে লাগল। যত নামে ততই মন ভরে যায়। পার্বতি গ্রুক্তি যেন নব-নব রূপে ধরা দিতে থাকে ওদের চোখে। এইখানে গাছে-গাছে কত ময়ুর। কী আনন্দ ! কী আনন্দ ! কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও বিষাদের কঠি হচ্ছে সহিমন জাভেরি ও আলফানসো আলবুকার্ক। এরা যে কেন মানুষকে জ্বালাবার জন্য তমেছিল পৃথিবীতে তা কে জানে ? এই দুই মহাপাতককে সৃষ্টি না করলে ভগবানের কী ক্ষতিটা হত ?

ওরা যখন পাহাড়ের একেবারে নীচে নেমে এসেছে তখন স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, ইধার ধরমশালা কিধার মিলেগো ?”

যাকে জিজ্ঞেস করা হল সে একটা বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল, “উধার।”

“ও ধরমশালা আচ্ছা হেবেগো ?”

“জরুর। ও তেলিসমাজ ধরমশাল বহু বড়িয়া হ্যায়। নেট কর

লো। তেলিসমাজ, অসালা, রামটেক। রাম মন্দির রোড। জিলা নাগপুর। কুপিয়া তি জয়দা লাগতা নেহি। শ্রেফ দশ-বিশ কুপাইয়া। উধার যাও। আরাম মিলেগা।”

“আচ্ছা, পানিবালা ধরমশালা কাহা মিলেগা ?”

“বগলমে। লেকিন ও ধরমশালা আচ্ছা নেহি। মাত যাও হৈয়া পর। বুটা আদমিকে লিয়ে ও ধরমশালা।”

বাবলু বলল, “ধন্যবাদ।” বলে তেলিসমাজ ধরমশালার দিকেই এগিয়ে চলল। যেতে-যেতে বাবলু বলল, “ভালই হল। এইখান থেকেই আমরা নজরদারি করতে পারব ওই ধর্মশালাটার দিকে। আশা করি এইখান আমাদের সকল বাধা দূর হবে।”

ওরা ধীর পায়ে এগিয়ে চলল ধর্মশালার দিকে। ধর্মশালার মাঝাখানের উঠোনে তখন বিরাট এক যজ্ঞ হচ্ছে। হলুদ, গেরুয়া, কতৰকমের পতাকা উঠছে পত্তন করে। যজ্ঞাল্পির ঘিয়ের গকে ভরে উঠেছে মন্ত্রাণ। কত অবাঙালি বউ-মেয়ের দল সুর করে গান গাইছে। গানের সুর, মন্ত্রের ধ্বনি, সবই যেন কেমন এক শায়াময়।

মাথায় পাগড়ি, বিশালবপু এক ম্যানেজার বসে ছিলেন গদিতে। লোকটিকে দেখলে হাসি পায়।

বাবলুরা গিয়ে ঘর চাইতেই বললেন, “ঘর নেহি মিলে গা। পুরা বুকিং হৈ গিয়া। দিবাত নেহি যাগ হৈ রাহি হ্যায়।”

বাবলু বলল, “সে তো দেখছি। কিন্তু আমরা যে কলকাতা থেকে এত দূর বেড়াতে এলাম, এখানে জায়গা না পেলে থাকব কোথায় ?”

“হাম ক্যা জানে ?”

বাবলু ওর পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে বলল, “দেখুন, আমরা প্রথম এসেছি এখানে। আপনার ধরমশালায় জায়গা না থাকে, আপনি কোথাও একটু ব্যবস্থা করে দিন আমাদের। না হলে আপনাদের দেশে এসে কোথায় যাব আমরা ? সঙ্গে মেয়েরা আছে।”

ম্যানেজার টাকাটা হাতে নিয়ে অবাক বিশ্বয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিক করে হেসে বললেন, “দেখো বাবুয়া, ঘর তুমনে হামকে কুপিয়া দে দিয়া তব তুমহারে লিয়ে কুচ-না-কুচ করনা হি

পড়েগো ।” বলেই ডাকলেন, “বাগারাম ! আরে, এ রামাই ভাইয়া ।”

বেঁটেখাটো একজন লোক এসে দাঁড়াল সেখানে, “কা হো ?”

“উপরবালা ঘর এ সবকো দে দো ।”

“রিজার্ভবালা ?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ । এক নাম্বার রুম । আউর শুনো, এ সবকো পরসাদ মিলনা চাহিয়ে ।”

বাগারাম ওদের নিয়ে উপরের ঘরে গেল । বেশ বড়সড় ঘর । অত্যেক ধর্মশালাতেই এইরকমের দু-একটা ঘর থাকে বিশেষ অতিথিদের জন্য । এই ঘরগুলো খুব একটা প্রয়োজন না হলৈ ব্যবহার করা হয় না । যাই হোক, পাঞ্চট গোয়েন্দাৰা সেই ঘরই পেয়ে গেল । নীচেটা একটু অদ্রকার । কিন্তু উপরটা খোলামেলা বলে বেশ আলো-বাতাসমযুক্ত ।

বাগারাম ওদের ঘর দিয়েই ধ্বণাধপ করে করেকটা গদি এনে ফেলে দিল সেই ঘরের ভেতর । বাচ্চু, বিচ্ছু আর কেয়া একদিকে ওদের বিছানা করে নিল । বাবলুৱা করল আৱ-একদিকে ।

বাগারাম লোকটিও খুব ভাল । বেশ হাসিখুশি । পঞ্চ ওৱ পা শুকতেই তুড়ুক করে লাখিয়ে উঠল একবার । তাৰপৰ বলল, “আৱেৰাবা । কাটেগো নেহি তো ?”

বাবলু বলল, “না । ও আমাদের পোষা কুকুৰ । তুমি ওৱ গায়ে হাত খুলাও, দেখবে ও কিছু বলবে না ।”

বাগারাম ভয়ে-ভয়েই পঞ্চুৰ পিঠে হাত বুলিয়ে দিল । বাস, ভাব হয়ে গেল পঞ্চুৰ সঙ্গে । পঞ্চু আৱ ওৱ পিছু ছাড়াল না । দিবি ধর্মশালাৰ নীচে-ওপৰ কৰতে লাগল । ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেৰ বাঢ়ি । কত ছেলেমেয়ে, লোকজন । ও তাদেৰ দলে ভিড়ে গেল । কতজনে কত কী বাণিয়াল পঞ্চুকে । যত্তেৰ পুৱেহিতৰাও তাদেৰ অনুষ্ঠানে কালো একটা কুকুৰ দেখে সাক্ষাৎ ধৰ্মীজি ভাবল পঞ্চুকে । কেউ-বা ফুল, বেলপাতা, শুকনো যই তুড়ে দিল ওৱ দিকে । কেউ কপালেৰ ওপৰ সিদুৱেৰ টিপ্পা দিয়ে মুখে একটা পুৰি কিংবা পাতা গুঁজে দিল । পঞ্চু তখন আনন্দে আঘাতাৰা ।

দৱেৰ বাবহা হয়ে গেলে শ্বানেৰ জন্য বাইৱে বেৱেল ওৱা । রামসাগৱ তালাওয়েল কাজল-কলো জলে বাঁপিয়ে পড়ে সীতার কাটিতে

লাগল কেয়া আৱ ভোবল । কেউ কাৰও চেয়ে কম যায় না । বাবলুৱা পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদেৰ সীতাৰ কটা দেখতে লাগল । কী অপূৰ্ব দৃশ্য এখানকাৰ । চাৰদিকেই পাহাড় । আৱ ঘন বনৱাজি ।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, “বাবলুৱা, আজ বিকেলে আৱ-একবাৰ পাহাড়ে উঠবে ?”

বাবলু বলল, “ওইসব পাহাড়ে উঠবাৰ রাস্তা আছে কিনা তা তো জানা নেই । তবে যে পাহাড় ডিঙিয়ে আমৰা নীচে এলাম সেই পাহাড়েই আৱ-একবাৰ উঠতে পাৰি ।”

বিলু বলল, “আমাদেৰ আসল কাজ তা হলে শুক হবে কৰন ?”

“আজ দুপুৰ হোকেই । এখানকাৰ ম্যানেজাৰ যেমন ভাল লোক, তেমনই সৱল ও সাদাসিধে বাগারাম । যেভাবেই হোক, টাকা-পয়সা দিয়ে বাগে আনতে হবে ওদেৰ । আমৰা অভিযানেৰ শুরুতে প্ৰথমে যেমন বাধা পোয়েছিলাম, এখন কিন্তু ভগৱান তেমনই আমাদেৰ দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন ।”

“কী কৰে বুকলি ? আসল কাজেৰ দিকে এক পাও তো এগোইনি আমৰা ।”

“কে বললে ? তা হলে হাওড়া থেকে আমৰা রামটোকে এলাম কী কৰে ? এখানে আমাদেৰ সবচেয়ে সুবিধে হয়েছে কী জানিস ? এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেৰ ভিড়ভট্টি । না হলে আমৰা যদি এই জনবিৱল জায়গায় এই ক'জনে এসে থাকতাম, তা হলে কিন্তু সকলেৰ চোখে পড়ে যেতাম । বিশেষ কৰে শক্রপক্ষৰা তো আগেই চিনে ফেলত । কিন্তু এখন এই ভিড়ভট্টিৰ কেউ নজৰ দেবে না আমাদেৰ দিকে । প্ৰথমত, ওৱা জানেও না আমৰা ওদেৰ পিছু নিয়েছি বলে । দ্বিতীয়ত, আমৰা ওদেৰ মুখোমুখি হলেও ওৱা ভাববে আমৰা এই ধর্মশালায় যীৱা অনুষ্ঠান কৰতে এসেছোন, তাদেৱই ছেলেমেয়ে । কাজেই এৱ চেয়ে সুবিধে আৱ কী আশা কৰা যায় ?”

ওৱা ম্যান কৰে ঘৰে এসে যখন বাইৱে খেতে বাণিয়াৰ তোড়জোড় কৰছে তেমন সময় ম্যানেজাৰ নিজে এসে বললেন, “আৱে এ মুনে ! তুম সব কিধাৰ যা রাহে ? কৰ্ণা গৱে থে তুম ?”

বাবলু বলল, “আমরা তালাত-পরগিয়েছিলাম মান করতে।”

“বাগারাম কুছ বতায়া নেহি তুমকো ?”

“না তো।”

“তুমকো পরসাদ মিলে গা। ভোজন হিয়া করোগে। আও মেরে সাথ।”

ওরা ঘরে তালা দিয়ে মানেজারের সঙ্গে নীচে এল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে খাবার আয়োজন হয়েছে। ওরা যেতেই কয়েকজন আবাঙ্গলি বউ এসে হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। তারপর সকলের সঙ্গে পাতা পেড়ে খেতে দিল ওদের। সে কী উপাদেয় খাদ্য। ভাল ধিয়ে ভাজা বড়-বড় পুরি, তরকারি, সবজি, ডাল, মুঁসের বরফি আর লাভচু। বাবলু দেওয়ালের একপাশে পঞ্চকে নিয়ে বসেছিল, আর ওর ভাগ থেকে ওকে খাইয়ে দিচ্ছিল একটু-একটু করে। তাই দেখে একটা বউ এগিয়ে এসে ওর জন্মাও আলাদা একটি পাতা করে দিল।

খেয়েদেয়ে ওরা বাড়ির ছাদের উপর উঠে এল সকলে। ছাদের ওপর থেকে চারদিকের দৃশ্য আরও মনোহর লাগলন- কলকাতার বুক থেকে শীত বিনায় নিলেও এখানে এখনও জাকিয়ে আছে। তবে হাড়-কাঁপানো শীত নেই। কিন্তু রাত্তিরে লাগবে গায়ে। এই ধর্মশালার বিপরীত দিকে একটা বাড়ির পাড়ি হল পানিবাল ধর্মশাল। যাত্রীহীন থী-থী করছে।

বাবলু বলল, “এইখান থেকেই ওই বাড়িটার দিকে নজর রাখা যাবে। সঙ্গের পর দেখব ঘরে আলো জ্বলে কি না। তারপর রাতের অঙ্কারাণ শুন করব কাজ। সংযুক্তাকে ওরা নিশ্চয়ই ওখানে নিয়ে এসে রেখেছে। নয়তো আজ-কালকের মধ্যেই আনবে। ওদের গতিবিধি লক্ষ করবার জন্মে এই বাড়ির মতো এত ভাল জায়গা আর হবে না।”

বিলু বলল, “ঠিক বলেছিস। এখন বাগারামকে ডেকে ওই বাড়ির স্বক্ষে একটু খোঁজখবর নিলে কেমন হয় ?”

বাবলু বলল, “ঠী। এখনই উপযুক্ত সময়। যা, চুপিচুপি গিয়ে ওকে ডেকে আন দেবি ?”

বাবলুর কথামতো বিলু নীচে গেল। তারপর বার্থ হয়ে ঘুরে এসে বলল, “না। ওকে কোথাও দেখছি না। আসলে কাজের বাড়ি তো,

নিরীহ লোক পেয়ে সবাই ওকে দারুণভাবে খটিছে।”

ওরা যখন বিশ্রাম নেওয়ার ছলে ছদের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছে, তখন হঠাৎই চিংকার করে উঠল কেয়া, “ওই, ওই তো সংযুক্ত। বাবলুনা...।”

বাবলু সঙ্গে-সঙ্গে মুখ চেপে ধরল কেয়ার। বলল, “করছ্টা কী ? সর্বনাশ হয়ে যাবে এখনই। পাকা ঘুটি কেঁচে যাবে যে।”

কেয়া চূপ করল। আশ্চর্য সুন্দর গন্ধৰ্বকন্যা যেন পানিবাল ধর্মশালার ছাদে রোদ পোহাতে উঠেছে। কী চমৎকার মেয়ে ! গায়ের গোলাপি রঙের ওপর সূর্যের আলো পড়ে আরও কলমল করছে। ওর মাও তো দেবী দুর্গার মতো দেখতে ছিলেন।

সংযুক্ত একভাবে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। এখান থেকে ওকে নাম ধরে ডাকা যাবে না। কেউ শুনতে পেলেও বিপদ আছে। বাবলু তাই বিলুকে বলল জোরে একটা শিস দিতে।

একটাতেই কাজ হল। ঘুরে তাকাল সংযুক্ত। কেয়াকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল আলসের ধারে। ও কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ঠোঁটের কাছে তর্জনি রেখে ওকে চূপ করতে বলল কেয়া। ইশারায় ওকে বলল সিডির দরজায় শিকল তুলে দিতে।

সংযুক্ত তাই করল। তারপর ভূ কুচকে ওর দিকে তাকিয়ে মুখটা এমনভাবে নাড়ল যাব অর্থ, তুই এখানে কী করে এলি ? তোকেও কেউ ধরে এনেছে নাকি ?

কেয়া সঙ্গেতেই জবাব দিল, না। এরা-আমরা এক।

বাবলু হাত নেড়ে ইশারা করল সংযুক্তকে। ওকে বুঝিয়ে দিল, তুমি একটু তৈরি থেকো, আমি এখনই যাচ্ছি। তারপর বিলুকে বলল, “শোন, তুই সবাইকে নিয়ে এখনেই থাক। চারদিকে নজর রাখ। আমি শুধু কেয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। পঞ্চও থাকবে সঙ্গে।”

ভোধল বলল, “এখনই কেন ? সঙ্গের পর গেলেই তো হত।”

বাবলু বলল, “চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী যেমন থাকে না কারণ প্রতীক্ষায়, তেমনই সময় ও সুযোগও হচ্ছে পদ্মপাতায় জল। সঙ্গের আগেই যে মেয়েটাকে ওরা সরিয়ে দেবে না কোথাও, তাই বা কে বলতে পারে ? এই

সুযোগ হাতছাড়া করে কথনও ? তা ছাড়া ধর্মশালায় লোক দিজগিজ করছে। এখন আমেলা বাধলে আমাদের চেচামেচিতে সবাই গিয়ে ঘাসিয়ে পড়তে পারবে।” এর পর বাবলু কেয়াকে সঙ্গে আসতে বলে পঞ্চকে নিয়ে তালা খুলে একবার ঘরে ঢুকল। তারপর ওর সেই আংটা-লাগানো নাইলনের ফিতেটা নিয়ে পিস্টলটাও ঠিক জায়গায় রেখে বাইরে এল।

বাস্তার ওপারে পানিবাল ধর্মশালার পেছন দিকেই পাহাড়ের একটি উচু জায়গা। ওরা রাস্তা পার হওয়ার মুখ্যেই কোথা থেকে যেন আপনের মতো এসে ঝুঁটে গেল বাগারাম। পঞ্চুর সামনের পা দুটো ধরে নাশরকম অঙ্গভঙ্গ শুরু করল। বলল, “তুম কাঁহা যা রহে হে দোষ্ট ?”

পঞ্চু বলল, “ভো-ভো।” অর্থাৎ এখন আমাকে ছাড়ো।

বাবলু বলল, “আমরা তোমাকে কত খুজলুম। কোথায় ছিলে তুমি ?”

“মন্দির গিয়া থা। লেকিন তুম কাঁহা যা রহে ?”

“থোড়া ঘুমনে যা তা।”

“হামকো ভি সাথ লে চলো। হাম তুমকো সব কুছু দিখলায় গা।”

বাবলু বলল, “পরে। এখন আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না। যখন যাৰ তখন তুমি সঙ্গে যোয়ো।”

বাগারাম বলল, “হাম হৱবখত তুমহারা সাথ রহে গা। আভি ভি যাউঙ্গা। বাদ মে ভি—।”

বাবলুর মনে হল একটা ঘুসি মেরে মুখটা ফাটিয়ে দেয় ওৱ। যত ওকে কঢ়িতে চাইছে ততই গায়ে লেপটে আসছে। অথচ এতক্ষণ ওর পাস্তাই ছিল না।

কেয়া বলল, “আমরা মন্দিরে যাচ্ছি। পাহাড়ের ওপৰ।”

বাবলু পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নেট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, “তুম এক কাজ করো, একটু চা-টা খেয়ে ধর্মশালার সামনে বসে থাকো। আমরা এসেই তোমাকে নিয়ে বেরোব।”

“লেকিন তুমকো আনে-যানে মে দে-তিন ঘণ্টা লাগ যায়গা।”

বাবলুরা কোনও উত্তর না দিয়ে হনহন করে এগোল।

সবে খানিকটা এগিয়েছে, বাগারাম অমনই ঝুঁটে এল, “আৱে ইধোৱ কাঁহা যা রহে হে তুম ? মন্দির কা মার্গ ইধোৱ নেহি হায়।”

বাবলু বলল, “আছা আপন তো, ঠিক সময়ে এসে ঝঞ্জট লাগিয়ে দিল।”

কেয়া বলল, “আমরা জানি বাবা এটা মন্দিরের রাস্তা নয়। এমনই একটু ঘুৱে দেখছি।”

বাগারাম বলল, “উধাৱ মাঁৎ যাও। ও জায়গা আছা নেহি।”

বিলুৰা এতক্ষণ ছানের ওপৰ থেকে সব লক্ষ কৰছিল। তাই বেগতিক দেখে নেমে এল বিলু। বাগারামকে ডেকে বলল, “এই শুনো, মানেজার বুলাতা তুমকো।”

পাপ তবু যাওয়াৰ নয়। বলল, “মানেজার আভি কাঁহা ? ও তো ধৰ চলা গিয়া। চার বাজে কা বাদ আয়েগা।”

এমন সময় ভাগাজ্বৰে হঠাৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একজনের চোখে পড়ে গেল বাগারাম। ওকে দেখতে পেয়েই হৃংক দিল সে, “আৱে, এ রাম্যা। ঘোড়পড়ে কা বৰ্তন লায়া তু ? জলদি লা। আড়ি শুন, সাহজিকো ভি বুলানা।”

বাগারাম জিভ কেঁটে পালাল।

আৱ সাহজিৱ নাম শুনেই আৰিকে উঠল বাবলু। এই সাহজিই তো সাইমনকে চিঠি দিয়ে ডাকিয়ে এনেছে। তা হলে কানেৰ খালৰে পড়ে গেল ওৱা ? সংযুক্তাকে উদ্বার কৰে ওই ধর্মশালাতে নিয়ে যাওয়াও আৱ নিৱাপদ নয়। তবু ওকে উদ্বার কৰতেই হৰে। এই মহুৰ্ত্তে বাবলুৰ মনেৰ অবহৃ যে কী, তা কাউকে বলে বোৰবাৰ নয়।

যাই হোক, ধর্মশালার দেওয়াল ধৈঘে চুপিচুপি ওৱা দু'জনে এগিয়ে চলল পেছনেৰ পাহাড়েৰ দিকে। বাবলু আৱ কেয়া। সঙ্গে চলল পঞ্চু। বিলু দূৰ থেকেই ওদেৱ দিকে লক্ষ কৰাল।

রত্তিবেলা হলে ভয়েৰ কোণও কাৰণ ছিল না। কিন্তু যত ভয় দিনেৰ আলোয়। কে কোথায় দেখতে পেয়ে যাব তাৱ ঠিক কী ? তবু এগোল। একসময় পায়ে-পায়ে পেছনদিকেৰ পাহাড়েৰ ওপৰ উঠে এল ওৱা। এসেই বুকল এই পথে সংযুক্তাকে নামিয়ে আনা একেবাৰেই

অসম্ভব । কেননা, ওরা দেখতে পেল দোতলার ঘরের ভেতর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক দূরের দিকে চেয়ে সিগারেট খাচ্ছে । লোকটার চোখ দুটো বেড়ালের মতো কটা । গায়ের রং তামাটো, ফরসা । চুলও কটা । এই কি তা হলে সাইমন ? খিদিরপুরের সন্দ্রাস এবং সংযুক্তার অপহরণকারী সাইমন জাভেরি ? হয়তো এই সে । বাবলু বেশ ভাল করে লক্ষ করে বুরুল লোকটা আসলে নররূপী চিতা ছাড়া কিছুই নয় ।

ওরা ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধর্মশালায় গা ঘেঁষে অন্যদিকে সরে এল । হকে বাঁধা নাইলনের ফিতেটো ছাদের দিকে ছুড়ে দিতেই সংযুক্তা লুকে নিল সেটাকে । তারপর ছাদের আলসের খাঁজে সেটাকে অটকে দিতেই অভ্যন্ত কায়দায় সুড়সুড় করে ওপরে উঠে গেল বাবলু । ওপরে ওঠার মুহূর্তে ওর একটা হাত ধরে ওকে টেনে তুলল সংযুক্তা ।

বাবলু চাপা গলায় বলল, “শোনো । আমরা তোমাকে উত্কার করব বলে এসেছি । তোমার বক্স কেয়াও আছে আমাদের সঙ্গে । তুমি কি পারবে আমরা মতো দড়ি বেয়ে নীচে নামতে ?”

“আমার খুব ভয় করবে । যদি পড়ে যাই !”

“এ ছাড়া তোমাকে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও রাস্তাই আমাদের কাছে খোলা নেই ।”

বাবলু আলসের কাছে গিয়ে বুকে দেখল, কেয়া পঞ্চকে নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে । ওপাশে ধর্মশালার ছাদে উদ্গ্রীব হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ভোঞ্জ, বাচু আর বিচু । বিলুটা কোনদিকে আছে তা কে জানে ?

বাবলু বলল, “তোমাকে ওরা কবে নিয়ে এসেছে এখানে ?”

“আজাই ।”

“কোন গাড়িতে এসেছ তুমি ?”

“গীতাঞ্জলিতে ।”

“সে কী ! ওই গাড়িতে তো আমরাও এসেছি ।”

“আমাকে ফার্স্ট ক্লাসে এনেছে । তাও বেরখা পরিয়ে । আর যে এনেছে সে ছিল মৌলভীর পোশাকে ।”

“বুঝেছি । ওখান থেকে নিশ্চয়ই মেটিলে এসেছ তুমি ?”

“হ্যা । সাহজিন গাড়িতে ।”

“সাহজিনকে চেনো তুমি ?”

“না । ওর মুখে নাম শনেছি ।”

“তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে জানো ?”

সংযুক্তা দুঁ হাতে মুখ দেকে কেবল, “কিছু জানি না আমি । আমার কিছু ভাল লাগছে না । বাবাকে, মাকে কতদিন যে দেখিনি ।”

বাবলু বলল, “ওরা তোমাকে আলফানসো আলবুকার্কের কাছে বিক্রি করে দেবে বলে ।”

“আলফানসো আলবুকার্ক কে ?”

“তা আমরাও জানি না ।”

এমন সময় আবার অফটন । সেই বামন বেঁটে বাগানামটা কোথেকে যেন শিশ্পাঞ্জির মতো লাঘাতে-লাঘাতে এসে হাজির হল সেইদিকে । তারপর কেয়াকে দেখেই বলল, “আরে মুঘি ! তুম অকেলে ইধাৰ ক্যা কৰতে হৈ ?”

বাবলু তখন ছুটে গেছে আলসের কাছে । গিয়েই দেখল বিলু হাত কামড়াচ্ছে । বাবলু ওকে ইশারায় বনাল, শিগগির ওদের সবহিকেই এখান থেকে সরে যেতে ।

বিলু কেয়াকে ইশারা করতেই কেয়া ছুটল বিলুর দিকে ।

আর এদিকে তখন সিডিতে মুপধাপ শব্দ । অথৰ্ব কেউ ছাদে আসছে সংযুক্তার খৌজে । এই মুহূর্তে পালানো অসম্ভব । অথচ এত কাণ্ডের পৰি শয়তানের হাতে ধৰা দেওয়াও যুক্তিযুক্ত নয় । বাবলু চকিতে মনস্থির করে সংযুক্তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, “কী করবে ? ধৰা দেবে, না পালাবে ?”

“পালানো অসম্ভব । আমি ওভাবে নামতে পারব না ।”

দরজায় তখন দমাদম ধাক্কা পড়ছে । বদ্বিনের পুরনো দরজা । খুলে যায় আর কী !

সাইমনের কুকু কঠিন ভেসে এল, “দরজায় শিকল দিল কে ? সংযুক্তা, দরোয়াজা খোলো ।”

বাবলু বলল, “বাচ্চার এখন একটাই রাস্তা, সিডির ছাদের ওপর উঠে পড়া।”

“কিন্তু ওখানেই বা উঠব কী করে ?”

বাবলু ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, “ওঠো।”

সংযুক্ত উঠতেই বাবলুও উঠল। তারপর পিস্টলটা বের করে পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়ে রইল দু'জনে। সংযুক্তাকে আড়ালে রেখে বাবলু একটু-একটু করে ঝুকে হেঁটে এগিয়ে গেল কী হয় দেখবার জন্য। তাড়াতাড়িতে একটু ভুল হয়ে গেছে। নাইলনের ফিতেটা শুটিয়ে নেওয়া হ্যানি।

ধনঘন ধাক্কাধাক্কিতে দরজাটা একসময় ক্রেম সমেত উলটে পড়ল ছাদের ওপর। সাইমন ঝড়ের বেগে উঠে এল ছাদে, “সংযুক্তি ! সংযুক্তি !” কিন্তু ছাদে এসে সংযুক্তাকে না দেখে ভীষণ রেগে ছাদময় দাপাদাপি করতে লাগল সে। তারপর হঠাৎই আলসের ধারে ঝুকে পড়ে দেখতে লাগল চারদিক। দেখতে-দেখতেই একসময় নজরে পড়ল ফিতেটা। ক্রোধে আগিশর্মা হয়ে স্টেটাকে তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল ছাদেই এক কোণে। তারপর নিফল আক্রমে হাত দুটো মুষ্টিবন্ধ করে বলে উঠল, “ও মাই গড়।” বলে উন্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল।

একসময় ধীরে-ধীরে যেমন এসেছিল তেমনই নেমে গেল সাইমন।

বাবলুও একটু-একটু করে মাথা তুলে ওপাশের ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত নড়ল। অথবা বুঝিয়ে দিল যান সাকসেসফুল।

সংযুক্তি বলল, “আর কোনও ভয় নেই তো ?

“আপাতত নেই। তবে আরও কিছুক্ষণ আমাদের এইভাবে থাকতে হবে। হ্যাতো কিছুটা রাত পর্যন্ত। কেননা ওরা এখন তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে চারদিক তোলপাড় করবে। তা ছাড়া তুমি যখন একান্তই ফিতে ধরে নামতে পারবে না তখন অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।”

সংযুক্তি বলল, “তুমি কে ? তোমার নাম কী ?”

বাবলু বলল, “পরিচয়টা পরে নিলে হত না ?”

“এখনই বা বলতে আপনি কী ?”

“আমার নাম বাবলু। আমরা মোট পাঁচজন। দুটি মেয়েও আছে আমাদের দলে। আর আছে একটা কুকুর।”

“তার এক চোখ কানা এবং গায়ের রং কালো। সবাই ওকে কানা পঞ্চ বলে, এই তো ? আর তোমরাই হচ্ছ বিখ্যাত পাণ্ডি গোয়েন্দা। তোমাদের নাম আমি অনেক শুনেছি। কেয়া আর আমি দু'জনেই কিন্তু তোমাদের ভক্ত। তাই বলি তোমরা ছাড়া এমন সাহস কর হবে !”

“তোমার বন্ধু কেয়াও কিন্তু কম সাহসী নয়।”

“ও বাবা, সাঁতারে, দোড়ে ওর জুড়ি নেই। ও কারাটে শেখে তা জানো ?”

“সে কী ! কিছুই বলেনি তো ও ?”

“তা না বলুক। কিন্তু তোমরা কী করে জানতে পারলে যে, আমি এগানে আছি ?”

“তুমি যে চড়িয়াল বাজারে ছিলে তাও জানতে পেরেছিলাম আমরা। প্রশংস রাতে সেখানেও হানা দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা যাওয়ার আগেই তোমাকে ওরা সরিয়ে ফেলেছিল। আচ্ছা, এবার বলো তো, তোমাদের ওই নায়েব টোধূরী লোকটি কীরকম ?”

বাবলুর এই কথার প্রথমে কোনও উত্তর দিতে পারল না সংযুক্তি। পরে এক সময় বলল, “এমনিতে তো মানুষটা ভালই।”

“আর ওর ছেলে মৈনাক টোধূরী ?”

“বোঝা মুশকিল। কেননা ও এখন সাইমনের হয়ে কাজ করছে। তা ছাড়া যে-লোকটা আমাকে চুরি করেছিল সেই ভুলু মণ্ডলেরও ডান হাত।”

“আচ্ছা, তুমি যে তোমার বাবা-মাকে চিঠি লিখতে, সেই চিঠিগুলো কে লেখাত ?”

“ভুলু মণ্ডল।”

বাবলু বলল, “এবার তা হলে শোনো, ভুলু মণ্ডলের খেলা শেষ। সাইমনও ওর কলকাতার পাট চুকিয়ে আলফানসো আলবুকার্কের দলে যোগ দিতে যাচ্ছে। কাজেই তোমাকে এখান থেকে নিয়ে কোনওরকমে

যদি পালাতে পারি, তা হলে আর কোনও ভয় নেই তোমার।”

কথা বলতে-বলতেই সকে হয়ে এল। আজই মধ্যরাতে হয়তো আলফানসো আলবুকার্ক এখানে আসবে। কাজেই ওদের সঙ্গে দেখা না করেও যেমন যাওয়া যায় না, তেমনই ভুলু মণ্ডলের ওই টাকাগুলোও উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে না দিলে ভুল হবে। অতএব প্রতীক্ষা করতেই হবে ওদের।

বাবলু সংযুক্তকে বলল, “তুমি ঠিক এইখানেই এইভাবে শয়ে থাকো। আমি একবার নীচে নেমে বেরোবার রাস্তাটা দেখে আসি। তারপর চুপিচুপি পালাব তোমাকে নিয়ে।”

বাবলু যাওয়ার কথা বলতেই দু’ হাতে ওকে চেপে ধরল সংযুক্ত। বলল, “না। আমাকে একবার রেখে তুমি কোথাও যাবে না। আমি খুব ভয় পাব তা হলে।”

“কিন্তু নীচে নামতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি?”

“পড়লে দু’জনেই পড়ব।”

বাবলু একবার ওদের ধর্মশালাটির দিকে তাকিয়ে দেখল। সেখানে কেউ নেই। থাকলেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো ওরা আশপাশেই কোথাও আছে। ও তাই সিডির ছাদ থেকে আলতো করে নেমে সংযুক্তকে বলল ওর কাঁধে পা রাখতে। সংযুক্ত তাই করলে একটু-একটু করে বসে পড়ল সে। এবার নামার সুবিধে হল।

যাই হোক, অক্কারে হাতড়ে বাবলু প্রথমেই কুড়িয়ে নিল ওর সেই নাইলনের ফিতেটা। তারপর সেটা পাকেটে নিয়ে আলসের ধারে এসে খুঁকে দেখল কেউ কোথাও আছে কি না। কিন্তু না। কেউ কোথাও নেই। গেল কোথায় সব? তবে কি ওদের কোনও বিপদ হল? ওদের দু’জনকে উদ্ধার করবার জন্য এই বাড়িতে চুক্তে গিয়ে কোনও বিপর্যয় বাধিয়ে বসল ওরা? যা হয় হবে। এখন যে-কোনও রকমেই হোক পালিয়ে বাঁচতে হবে এই শক্তপূরী থেকে। সংযুক্ত সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু কেয়ার মতো চটপটে নয়। তাই ওকে নিয়ে পদে পদে বিপদ। বাধা পেলে রাখে দাঁড়ানো দুরের কথা, উলটে জড়িয়ে ধরবে। তবু ওর একটা হাত ধরে চুপিচুপি সিডি বেয়ে নীচে নামতে লাগল বাবলু।

৯২

একটা ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ান ওরা। ভেতরে উন্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

কে যেন বলছে, “আয়সা বুরবাকি তুমনে কিউ কিয়া?”

“আপ সমবানে কা কোশিস তো করো সাহজী।”

“তুম হামকো ক্যা সমবাওগে সাইমন? ও লেড়কি সে জায়দা ভালুয়েবল শ’ও ক্রোড় কি সোনা। আজই আমি রাত কো ও ট্রাক লেকে তুম বোঝাই চলা যাও। আউর খেয়াল রাখ না পুলিশ তুমহারা পিছে না পড়ে।”

“লেকিন...।”

“লেকিন-ফেকিন কুছ নেহি। ইয়ে তুমহারা পহেলা কাম। আলফানসো আলবুকার্ক কাম মাংতা। লেকিন নেহি।”

“ও লেড়কি কে ক্যা হোগা?”

“ভাগে গা কাঁহা ও। সূরজ কি রশি বিধার নেহি ঘুসেগা, মেরে নজর উস তরফ ভি হোগা। তুম চিন্তা না করো।”

“ও ট্রাক কিধার রহেগা?”

“তালাও কি পাস। রাত বারো বাজে। এম. কে. পি. জিরো জিরো নাইন।”

বাবলু আর কিছু শোনার প্রয়োজন মনে করল না। সংযুক্তকে নিয়ে থারে-থারে নেমে এল নীচে। এসেই দেখল ডাকাতের মতো চারজন লোক বসে-বসে তাস খেলছে সেখানে। ওদের টপকে দলানের দরজার কাছে যাওয়া অসম্ভব। তাই আবার উঠে এল ওপরে। ছাদে এসে সংযুক্তকে বলল বাবলু, “দেখলে তো নীচের অবস্থাটা? এখন কী করবে বলো? ওদের হাতে ধরা দেবে? না, সাহস করে পালাবে?”

সংযুক্ত বলল, “পালাব।”

ওরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এল। এইদিকে অৱ একটু বুলে নামলেই সহজে নামা যায়। তবে সমস্যা হচ্ছে একটাই। এইদিকের ঘৰেই বসে আছে সাইমন ও সাহজি।

বাবলুরা এইদিকে আসতেই দেখল ছায়া-ছায়া, কালো-কালো কারা যেন অক্কারে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে। তাদের দেখেই চিনতে

৯৩

ପାରଲ ବାବଲୁ । ଓପର ଥେକେଇ ହାତ ନାଡ଼ିଲ । ଓରାଓ ହାତ ନେଡ଼େ ଜାନାନ ଓରା ରେଡ଼ି ।

ସଂୟୁକ୍ତ ବଲଲ, “ଓରା କାରା ?”

“ଆମାର ବକ୍ରରା । ପାତ୍ରବ ଗୋଯେନ୍ଦାର ବାହିନୀ ।”

“କେଯା କୋଥାଯା ?”

“ଓଦେର ଦଲେଇ ଆଛେ ।”

ବାବଲୁ ନାଇଲନେର ଫିତରେ ହକ୍ଟା ଆଲ୍‌ସେର ଖାଁଜେ କାଯଦାମତୋ ଆଟକେ ସଂୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଲଲ, “ନାମୋ ।”

ସଂୟୁକ୍ତ ସେଟା ଧରେ ନୀଚେ ନାମତେ ଗିହେଇ ଭୟେ ଟିକାର କରେ ଉଠିଲ । ଯେଇ ନା କରା, ବାବଲୁ ଅମନଇ ରାଗେ ଅକ୍ଷ ହେଁ ଓର ଗାଲେ ଠାସ କରେ ମାରଲ ଏକଟା ଚଡ । ଚଡ ଥେବେଇ ଥିତିଯେ ଗେଲ ସଂୟୁକ୍ତା । ବାବଲୁଓ ନାଭସି ହେଁ ପଡ଼ିଲ ।

ସଂୟୁକ୍ତା ନିଜେର ଭୁଲ ବୁଝିତେ ପାରଲ ଏବାର । ତାଇ ଏକଟୁ ଓ ଦେଇ ନା କରେ ସେଇ ଫିତେ ଧରେ ଅର୍ଧପଥ ଥେକେଇ ଲାଖିଯେ ପଡ଼ିଲ ନୀଚେ ।

ଆର ବାବଲୁ ? ସେ କୋନାଓ କିଛି ବୁଝେ ଓଠାର ଆଗେଇ ଓର ଓପର ଚିତାର ମତୋ ବାପିଯେ ପଡ଼େଇ ସାଇମନ । ଦୁ’ ହାତେ ବାବଲୁର କାଁଧେ ବାକନି ଦିଯେ ଏକ କଟକାଯ ହୁଏ ଫେଲେ ଦିଲ ଓକେ । ବାବଲୁଓ ତଥନ ଅନ୍ଧାରର କୋଣ ଥେକେ ଲାଖିଯେ ଓର ଚୋଯାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏମନ ଏକଟା ଘୁସି ଦିଲ ଯେ, ଛିଟକେ ପଡ଼ିଲ ସାଇମନ । କିନ୍ତୁ ସାଇମନେର ଶୀର୍ଷରେ ବାଧେର ଶକ୍ତି । ତାଇ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣେର ବାଧା ଟେକାତେ ପାରଲ ନା ବାବଲୁ । ଓ ଏମନଭାବେ ଓର ଓପର ବାପିଯେ ପଡ଼ିଲ ଯେ, ପିନ୍ତୁଲଟାଓ ବେର କରବାର ସମୟ ପେଲ ନା । ତତକଣେ ନୀଚେର ଲୋକେବା ଏସେ ଆଟ୍ରେପ୍ରେଷ୍ଟେ ବୈଧେ ଫେଲିଲ ବାବଲୁକେ । ତାରପର ଯେ ଧରେ ଶାହଜି ବସେ ଛିଲ ସେଇ ଧରେ ଚୁକିଯେ ଦିଲ ।

ଶାହଜି ଓର ଚୁଲେର ମୁଠି ଧରେ ବଲଲେନ, “ତୁମ ଇଥାର କିଉ ଆୟା ?”

ବାବଲୁ ବଲଲ, “ସାଇମନ ଲେ ଆୟା ହାମକୋ ।”

ଶାହଜି ବଲଲେନ, “ସାଇମନ ତୁମକୋ ଲେ ଆୟା ?”

“ହୀ ।” ବଲେଇ ଚୁପ କରିଲ ।

କେନନା ସାଇମନ ତଥନ ଧରେ ଚୁକେଛେ ।

ଶାହଜି ବଲଲେନ, “ତୁମି ବାଂଲା ମେ ବୋଲୋ । ସମଝେଗା ହାମ ।”

ବାବଲୁ ବଲଲ, “ଶାହଜି, ଆପନାର ସମେ ଆମାର କୋନାଓ ଦୁଶମନି ନେଇ । ଏହି ସାଇମନ ଆମାଦେର ଏକ ବହିନିକେ ଚୁରି କରେ ଲୁକିଯେ ରାଖେ । ଓ ର ସମେ ଭୁଲୁବାସୁ ନାମେଓ ଆମାଦେର ଗ୍ରାମେର ଏକଜନ ଲୋକ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈହିମନ ସାଇମନ ସେଇ ଭୁଲୁବାସୁକେ ମେରେ ତାର ଦଶ ଲାଖ ରାପିଯା ନିଯେ ପାଲିଯେ ଏମେହେ ।”

ସାଇମନ ଟିକାର କରେ ଉଠିଲ, “ବୁଟା ବାତ ।”

ଶାହଜି ବଲଲେନ, “ଭୁଲୁବାସୁକେ ସାଇମନ ମାର୍ତ୍ତିର କରିଯାଇଛେ ?”

“ହୀ । ମରବାର ଆଗେ ଭୁଲୁବାସୁ ସବ ବଲେଇ ଆମାଦେର । ତାଇ ତୋ ଆମରା ଓ ପିଛୁ ନିଯେ ଏଥାନେ ଆସି । ନାଗପୁର ଟେଶନେ ଆମରା ଯଥନ ହାତେନାତେ ଧରେ ଫେଲି ଓକେ, ଓ ତଥନ ଆମାଦେର ଟାକାର ଲୋଭ ଦେଖାଯା ।”

ଶାହଜି ଏକବାର ଆଡ଼ଚୋଥେ ତାକାଲେନ ସାଇମନେର ଦିକେ ।

ସାଇମନ ବଲଲ, “ଏ ଭି ବୁଟା ହାଯ ।”

ବାବଲୁ ବଲଲ, “ଆମରା ସାଇମନକେ ବଲି ଆମାଦେର ରାପିଯାର ଦରକାର ନେଇ । ଶୁଦ୍ଧ ମେଯୋଟାକେ ଫେରତ ଦାଓ । ଓ ତଥନ ଏହି ଧର୍ମଶାଲାର ଠିକାନା ଆମାଦେର ଦେଯ । ଆମରା କୀତାବେ ଏଥାନେ ଆସବ ସେବ କଥା ଓ ବଲେ ଦେବ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ ଶାହଜି, ଆମରା ଲୁକିଯେ ଓର କଥାବାର୍ତ୍ତ ଶୁନେଛି । ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭୁଲୁବାସୁକେ ନୟ, ଆପନାକେଓ ଖୁନ କରବାର ମତଲବ କରେଛେ । ଆର ଏଣେ ଜେନେ ରାଧନ, ଆଲଫାନସୋ ଆଲବୁକାର୍ବେ ଓଇ ସୋନା କୋନାଓଦିନଇ ବୋଥିଇ ଗିଯେ ପୌଛିବେ ନା । ଓ ଡିନିସି ଅନା ଜାଯଗାୟ ପାଚାର କରେ ଦେବେ ।”

ସାଇମନ ଟିକାର କରେ ଉଠିଲ, “ସବ ବୁଟା ହାଯ ।”

ବାବଲୁ ବଲଲ, “ଓ ଜିନିସପଞ୍ଚର ଶର୍ତ୍ତ କରିଲ ଶାହଜି । ତା ହଲେଇ ବୁଝିତେ ପାରିବନ ଆମର କଥା ସତି କି ମିଥେ । ଦେଖୁନ ଓର ବ୍ୟାଗ ଥେକେ ଦଶ ଲାଖ ଟକା ପାଓୟା ଯାଯି କି ନା ।”

ସାଇମନେର ମୁଖ ଧରେ ଫ୍ଲାକାସେ ହେଁ ଗେଲ ।

ଶାହଜି ତୌର ଲୋକେଦେର ବଲଲେନ, “ଦେଖୋ ତୋ ।”

ବାବଲୁ ବଲଲ, “ଆରଓ ପ୍ରମାଣ ଚାନ ? ତା ହଲେ ଆମର ବୀଧିନଟା ଖୁଲେ ଦିନ । ଆମିଇ ସବ ଦେଖାଛି ।”

ଶାହଜି ନିଜେ ଓକେ ବୀଧିନମୁକ୍ତ କରିଲେ । ଭୁଲୁ ମଣିଲେ ହାତ ଥେକେ ନେଓଯା ସେଇ ଚିଠିଟା ବାବଲୁ ଶାହଜିର ହାତେ ଦିଯେ ବଲଲ, “ଏହି ଦେଖୁନ, ଏଟା

আমার চিঠি কি না । এই চিঠিতে এখানকার ঠিকানা ছিল । সাইমন না দিলে এই চিঠি কি আমাদের কাছে আসত ? বলুন ?”

সাইমনের চোখে যদি আগুন থাকে তো সাহজির চোখে তখন দাবানল ।

এদিকে সাইমনের বাগের ভেতর থেকে দশ লাখ টাকাও পাওয়া গেল ।

সাহজি সাইমনকে বললেন, “আভি ক্যা জবাব দেওগে তুম ? এ তি বুটা হ্যায় ?”

সাইমনের মুখে কথা নেই ।

“আরে কুন্ত তো বোলো, চুপ হো গিয়া কিউ ?”

সাহজির নির্দেশ পাওয়ার আগেই সেই লোকগুলো দুদিক থেকে দুটো হাত চেপে ধরেছে সাইমনের ।

বাবলু বলল, “সাহজি ! আমি এবার আসি । আপনারা উচিত শিক্ষা দিন এই শয়তানকে । আমাদের মেয়ে আমরা পেয়ে গেছি । এবার ঘরের ছেলে ঘরে যাই ।”

সাহজি বললেন, “লেকিন ইধার কা বাত কিসিকো মাত বোলনা ।”

বাবলু বলল, “আপনার সঙ্গে আমাদের দোষ্টি । দুশ্মনি তো নেই । আজ আমরা ওই ধর্মশালায় আছি । কাল সকালে নাগপুর চলে যাব ।” বলে, যেতে গিয়েও দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, “সেলাম সাইমন ভাই । অস্থিকাবাবু আর ভজহরিকে খুন করেও তুমি কিন্তু রেহাই পেলে না । এবার তোমার পালা ।”

সাইমন সিংহগঞ্জ করে বলল, “উসকো মাত যানে দো । ও পুলিশ কা লেড়কা । ও সবকো ফাঁসায় গা । রোখো রোখো, জলনি রোখো ।”

সাহজি বললেন, “ও খেয়াল হ্যাম রাখেছে । আভি যানে দো । সেকিন তুমকো সমব্যায়গা আলবুকার্ক ।”

সাইমন বলল, “আরে মাথামোটা, এইটুকু বুঝলে না তোমরা, ও আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে । তাই পুরো চালাকি করে বেরিয়ে গেল । ও তো এখনই গিয়ে পুলিশে খবর দেবে । ওদের কথা তোমাদের আগেই তো বলেছি । পাওয়া গোয়েন্দা । পুলিশ ওদের পেছনে আছে । না হলে

এইভাবে এত দূরে ওরা আসতে পারে ?”

ঘরের ভেতর বোমা পড়লে যা না হত, তাই হল এবার ।

সাহজি গাঁক করে উঠলেন, “আরে রাম নাম সত্যা হ্যায় । পাওয়া গোয়েন্দা ? তব তো বটি খতরনক ।” বলেই লোকদের বললেন, “যাও, জলনি পাকড়ো ও শয়তানকো । জিন্দা ইয়া মুর্দা । তুরস্ত যাও ।”

সাহজির লোকেরা তখন সাইমনকে ছেড়ে বাবলুর পিছু নিল । কিন্তু বাবলু তখন কোথায় ? সে তখন নাগালের বাইরে । বাড়ির বাইরে এসেই যথারীতি দরজায় শিকলটা তুলে দিয়েছিল সে । তারপর বিলুরা যেখানে ছিল সেইখানে ছুটে এসে বলল, “বিলু ! তুই এখনই ধর্মশালা থেকে আমাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আয় । আমাদের এ জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে । বছকটৈ বেঁচে ফিরেছি । তবে আসবার আগে সব কঠাকে পূরে এসেছি জাতাকলে । শিগগির যা ।”

“কিন্তু এই রাতে কী করে কোথায় যাবি ?”

“আপাতত জঙ্গলে তো লুকোতে পারব । তুই যা । আমি এখানে দেখছি । ঘরের দরজায় আমি শিকল দিতে পারিনি । কিন্তু দিয়েছি নীচের দরজায় । তাই ওরা হয়তো ছাদ বেয়ে নামবার চেষ্টা করবে । কিন্তু এদিকে এলেই মরবে ওরা । পঞ্চাই ওদের ছিড়ে যাবে ।”

বিলু আর ভোঁদল দুজনেই ছুটল ।

সংযুক্তা, কেয়া, বাচু, বিছু ও পঞ্চকে নিয়ে বাবলু অঙ্ককারে লুকিয়ে রইল একপাশে । ওর আশঙ্কাটাই ঠিক । একটু পরেই ছাদের ওপর গোল-গোল মাথা দেখা গেল কয়েকটি । তারপর যেই না নামতে গেল অমনই শুরু হল পঞ্চর চিংকার ও পাথরের বৃষ্টি । সাহজি ছাদের ওপর থেকে তখন বিকট চিংকার করছেন ।

বাবলু বলল, “সর্বনাশ হয়েছে । ওর চেঁচানিতে আকৃষ্ট হয়ে যদি এখনই হানীয় লোকজন সব এসে পড়ে তা হলে কিন্তু আমাদেরই বিপদ । কেননা সাহজি এখানকার শেষে । লোকে ওর কথাই বিশ্বাস করবে । আমাদের কথা নয় । মারবে আমাদের ।”

ভোঁদল বলল, “কী করবি তা হলে ?”

“সাহজির জন্যে একটাই মাত বুলেট খরচা করব আমি ।” বলেই সেই

অঙ্ককারের আড়ালে বসে ত্রিপার টিপল, “ডিস্যুম।” কঠস্বর নীরব হয়ে গেল।

ততক্ষণে ওরাও ওপর থেকে মেশিনগান, পাইপগান, বন্দুক, যার যা ছিল, নিয়ে এসেছে। সাইমনের কঠস্বরও শোনা গেল, “ফায়ার! ফায়ার।”

বাবলুরা তখন ওদের নাগালের বাইরে সরে এসেছে। বিলুও ততক্ষণে চলে এসেছে জিনিসপত্র নিয়ে। এদিকে গোলাগুলির শব্দে অনেক লোকজন ছুটে এসেছে সেখানে। মজার ব্যাপার এই, দুর্ভীরা ভাবছে ওদের দলে পাওব গোয়েন্দারাও আছে। তাই বুকুরের ভয়ে নামতে সাহস করছে না কেউ। আর স্থানীয় লোকেরা ভাবছে ডাকাত পড়েছে বাড়িতে, তাই চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে এবং এলোপাথাড়ি ইট ও পাথর ছুড়েছে।

বাবলু বলল, “এখন আমরা অনেকটা নিরাপদ। ওদের খণ্ডযুদ্ধ চলতেই থাকুক। আমরা সোজা পুলিশে খবর দিইগে চল।” এই বলে তালাওয়ের কাছে এসে একটা অটো ভাড়া নিয়ে উঠে পড়ল সকলে। অটোচালক কিছু জিঞ্জেস করবার আগেই বাবলু বলল, “পুলিশ স্টেশন।”

অটো দু’ মিনিটের মধ্যেই থানার সামনে এসে থামল। বহু সাধারণ পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর লোকেরা আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল তখন। তারা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল ওদের। ওরা কিন্তু কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা অফিসঘরে চুকে গেল।

এইখানকার থানার ও.সি. বেশ ভারিকি মেজাজের এবং বদমেজাজি লোক। ওদের ওইভাবে চুকে পড়তে দেখেই গাঁক করে উঠলেন। তারপর বাবলু যখন সব কথা আধা-বাংলা, আধা-হিন্দিতে বুঝিয়ে বলল, তখন সঙ্গে-সঙ্গে ওদের কথার শুরুত্ব উপলক্ষ করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে জড়ো করে ফেললেন পুলিশের এক বিরাট ব্যাটেলিয়ানকে। শুধু তাই নয়, হেড অফিস নাগপুরেও খবর পাঠিয়ে যুক্তের জন্য তৈরি হলেন।

বাবলু বলল, “আপনারা একটু তাড়াতাড়ি যান। ওই দশ লাখ টাকা

আর সোনা বোঝাই লরি, এর কোনওটাই যেন হ্যাতছাড়া না হয়।”

ও.সি.বললেন, “তুম তি চলো হামরা সাথ।”

অতএব সবাইকে থানায় বসিয়ে রেখে বাবলুও চলল পুলিশের সঙ্গে। গিয়ে দেখল লোকে লোকারণ্য চারদিক। গুলির ঘায়ে অনেকেই আহত হয়েছে। সাধারণ মানুষ মশস্তু ডাকাতদের সঙ্গে কঠকণ যুদ্ধ করতে পারে? তাই হাল ছেড়েছে সব।

পুলিশ যখন গেল তখন গোলাগুলি বন্ধ। জনতার মুখে শোনা গেল দুর্ভীরা গুলি করতে-করতে জঙ্গলের দিকে পালিয়েছে।

যাই হোক, বাড়ি তলাপি করে কিছুই পাওয়া গেল না। দশ লাখ টাকা দূরের কথা, একখানা ছেঁড়া নেটও মিলল না কোথাও। ওদের দলের ওই চারজনই সব নিয়ে পালিয়েছে। সাতজিরও পাত্র নেই। শুধু ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে গুলিতে বাঁকরা সাইমনের ডেড বড়টা পড়ে আছে। এইবক্তব্য কঠিন মূল্যে যে নিজেকে বিকোতে হবে, সাইমন তা কখনও ভাবেনি বোধ হয়।

পুলিশ এবার অনেক চেষ্টা করল আলফানসো আলবুকার্কের সোনা বোঝাই সেই লরিটা পেতে। যার নম্বর হচ্ছে এম. কে. পি. জিরো জিরো নাইন। কিন্তু সেই লরি দূরের কথা, এই এলাকার মধ্যে কোনও লরিই দেখতে পাওয়া গেল না তখন।

বাবলু ভাবল, তবে কি ওরা লরি সমেতই উধাও হয়েছে? পুলিশ তখন যেখানে যত লরি আছে সবই আটক করবার নির্দেশ দিল। আর তলাপি চালাল সাতজির আড়তে।

বাবলুরা পুলিশের সাহায্য নিয়েই পালিয়ে এল নাগপুরে। সংযুক্ত-উক্তার হয়ে গেছে। আলফানসো আলবুকার্ক দূরে থাক, সাইমন জাতেরির মৃত্যুও ওরা নিজের চেথে দেখেছে। এখন একটা ভাল হোটেলে রাত্রিটা কাটিয়ে সকালের ট্রেনে বাড়ির দিকে রওনা হলেই নিশ্চিন্ত। এই ভেবে ওরা স্টেশনের সামনেই একটা বড় হোটেলে এসে সে-রাতের মতো আশ্রয় নিল।

হোটেলটা চারতলা । ওরা তিনতলার একটা বড় ঘর বুক করল । হোটেল ঠিক নয়, লজ । একদম নীচে খাবার ব্যবহৃত । লোকজনে গমগম করছে । ওরা ঘরে জিনিসপত্র রেখে নীচে গিয়ে খাবার টেবিলে বসল । সারাদিন পেটে ভাত নেই । খিদেয় পেট চো-চো করছে । ভোঁদল তো এককথায় মাংস-ভাতের অর্ডার দিল । সকাল থেকে পুরি, পাঁড়া খেয়ে আছে । খাইয়ে-ছেলে বেচারি, ওর কথনও পোষায় ?

খাবার এলে সকলেই খেতে লাগল । খেল না সংযুক্তা । ওর দু চোখ যেন জলে ভরে আসতে লাগল । কেয়া কত সাধ্যসাধনা করতে লাগল ।

বাবলু একবার তাকিয়ে দেখল ওর দিকে । তারপর বলল, “বুঝেছি । তখন চড় মেরেছিলাম, সেইজন্যে অভিমান হয়েছে বুঝি ?”

সংযুক্তা নীরব ।

বাবলু বলল, “ঠিক আছে । তুমি যদি না খাও আমিও তা হলে খাব না ।”

সংযুক্তা বলল, “আমার মা-বাবা কথনও আমার গায়ে হাত দেননি ।”

বাবলু বলল, “তুমি তোমার বাবা-মায়ের বুব আদরের, না ? তাই যদি হয় তা হলে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে গুঁরা আমাদের পাঠালেন কেন ? নিজেরা আসতে পারলেন না ?”

অশ্রসঙ্গল চোখে সংযুক্তা এবার বাবলুর দিকে স্পষ্ট করে তাকাল ।

বাবলু উঠে এসে কুমালের খুঁটি দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে বলল, “এইসব সেটিমেন্ট মনের মধ্যে পুষে রাখতে নেই । চড় না খেলে তুমি অত সহজে নীচে নামতে ? তোমার জন্যে সাইমনের হাতে আমি কীরকম মার খেলাম, সে-কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না ? বেশ, এই যদি হয় তা হলে এর পর থেকে আমি আর কারও জন্যে কিছুই করব না । আমি তো ভাড়াটে গুণ্ঠা নই যে, এইসব করে বেড়াব ।”

সংযুক্তা কাছা থামিয়ে বলল, “বাস । ঠিক আছে । আর কিছু বলবে না তুমি । আমার অন্যায় হয়েছে । এবার খাও ।”

কেয়া একটু ভাত, মাংসের বোলে মেখে ওর মুখে তুলে দিল ।

সংযুক্তা খেতে-খেতে বলল, “কী হল, খাও ।”

বাবলুও খেতে শুরু করল । খেতে-খেতেই বাবলুর হঠাত চোখ পড়ল এমন একজনের দিকে, যাকে দেখলেই বুকের রক্ত ছলাত করে ওঠে । লোকটা কোন দেশি বা কোন জাতি, কিছুই বুঝতে পারল না । যেমন লম্বা তেমনই কালো । শেয়াল কিংবা কুমিরের মুখের সঙ্গে ছাড়া সে-মুখের তুলনা হয় না । মাথায় টুপি । সম্পূর্ণ অন্য ধরনের সাজপোশাক । কুতকুতে হিঁর চোখ । লোকটা খেতে-খেতে একদৃষ্টি ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল । মুখ নাড়িবার সময় বাবলু বুঝতে পারল ওর সব কটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো । গলায় একটা ক্রস । লোকটা একবার বুক পকেট থেকে একটা ছবি বের করে দেখল । তারপর একভাবে তাকিয়ে রইল সংযুক্তার দিকে ।

বাবলু আর কাউকে কোনওরকম ইঙ্গিত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইল না । লোকটা একা নয়, সঙ্গে আরও দুজন আছে । খাওয়া মাথায় উঠে গেল বাবলুর । ওর মনের মধ্যে শুধুই তোলপাড় করতে লাগল কে এই লোকটি ? ওর শকুনের চোখ ওদের দিকে কেন ? লোকটি সংযুক্তার দিকেই বা তাকাচ্ছে কেন বাববার ?

পপ্পও বাবলুর পায়ের কাছে বসে ছিল । একটুকরো মাংস ওর মুখে দিয়ে উঠে গেল বেসিনের দিকে । তারপর মুখ-হাত ধূতে গিয়েও দেখল লোকটি একভাবে কথনও তাকাচ্ছে ওর দিকে, কথনও দেখছে সংযুক্তাকে ।

ব্যাপারটা বিলু, ভোঁদলও লক্ষ করল । বাচ্ছ, বিজ্ঞুও । ওরা স্বাই দেখল এক ড্যাফর লোক খাবার টেবিলে বসে বাববার তাকাচ্ছে ওদের দিকে । লোকটিকে দেখলেই কেমন যেন ভয় হয় । ওর চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় যেন হঠাত কোনও নরখাদকের মুখোযুবি পড়ে গেছে । বাবলুকে উঠতে দেখে ওরাও উঠল এক-এক করে । তারপর হাত-মুখ ধূয়ে খাবারের বিল মিটিয়ে লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য চলে এল তিনতলায় । ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ নীরব রইল সকলে ।

ওদের ভাবগতিক দেখে সংযুক্তাই বলল, “কী হল ? তোমরা হঠাত

এইরকম হয়ে গেলে কেন ? মনে হচ্ছে যেন কোনও কিছু দেখে ভয় পেয়েছ ?”

বাবলু বলল, “হ্যাঁ ! খারাপ জিনিস থেকে যেমন দুর্গম্ব বেরোয়, আমরাও তেমনই খাবার টেবিলে বসে কোনও খারাপ লোকের অশ্বত্তি উপস্থিতি অনুভব করেছি ।”

বিলু বলল, “কীরকম যেন সাপের মতো চেথের চাউনি লোকটার ।”

ভোষ্টল বলল, “কে হতে পারে বলো তো ?”

বাবলু বলল, “হয়তো কেউ নয় । এমনিই কৌতুহলের বশে দেখছে আমাদের । সংযুক্তির ফেস কাটিং ভাল লাগছে বলে দেখছে । আবার এমনও তো হতে পারে, এই লোকটাই সেই কুখ্যাত সোনা পাচারকারী চক্রের একজন । আজ মধ্যাবাতে যার পানিবালে উপস্থিত হওয়ার কথা ।”

বিলু বলল, “তার মানে তুই কি বলতে চাস, এই সেই আলফানসো আলবুকার্ক ?”

“মন্টা যেন তাই বলছে ।”

সবার মুখই শুকিয়ে এতকুক হয়ে গেল । অন্য কিছু নয় । বছকটৈ সাইমনের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছে সংযুক্তাকে, কিন্তু এই লোক যদি আলবুকার্ক হয়, তা হলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো খুব একটা সহজ কাজ নয় ।

বাবলু বলল, “তোরা একটু বোস । আমি আর-একবার উকি মেরে দেখে আসি লোকটা এখনও আছে কিনা । যদি থাকে ম্যানেজারের ঘর থেকে থানায় একটা ফোন করে দেব ।”

বিলু বলল, “কী বলে ফোন করবি ?”

“পরিষ্কারভাবে বলে দেব আমরা একজনকে সদেহ করছি আলফানসো আলবুকার্ক বলে । এই শহরে আজকে ওর উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত নয় । সোনা পাচারের এমন একটা দৌও মারতে যাচ্ছে যে, সে এখানে থাকবে না তা কি হয় ?”

বিলু বলল, “চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে । লোকটা যদি সতিই আলবুকার্ক হয় তা হলে কিন্তু সবারই বিপদ । রামটেকের ঘটনা কি ও না

জানে ভেবেছিস ? ও আমাদের সকলের উপরই চড়াও হতে পারে ।”

সংযুক্তি আর কেয়া দুজনেই দুজনকে তখন জড়িয়ে ধরেছে । বাচু, বিলু স্থির । ভোষ্টল একেবারে বোবা হয়ে গেছে ।

বাবলু, বিলু আর পঞ্চ একসঙ্গে ঘর থেকে বের হল । ওরা পা টিপে-টিপে সিডির ওপর থেকে নীচে নেমেই দেখল ডাইনিং টেবিলে বসে থাকা সেই লোকটি উধাও । এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল । শুধু লোকটি নয়, তার সঙ্গী দুজনের একজনকেও দেখা গেল না ।

বাবলু বিলুকে বলল, “পঞ্চকে নিয়ে বাইরে গেটের কাছে থাক তুই । আমি ভেতরটা দেখছি ।” বলে লোকটি যেখানে বসে থাক্কিল সেইখানে এসে দাঁড়াল ।

একজন এসে বলল, “তুমহারা যানা তো মিল গিয়া । তব হিয়া ক্যা করতে হ্যে ?”

বাবলু বলল, “আচ্ছা, একটু আগে এখানে বসে যারা থাক্কিল তারা কি তোমাদের এই লজেই উঠেছে ?”

“ও শেষ হিয়া কিউ রহেগা ? বহতই ইজ্জতদার আদমি । শ্রেফ যানা যানে আয়া ।”

“ক্যা নাম ও শেষেকা ?”

“জায়দা বাত না করো । যাও, ভাগো ।”

বাবলু সোজা ম্যানেজারের ঘরে এসে বলল, “নাগপুর পি.এস-এ আমি একটা ফোন করতে চাই । কাইভলি ফোন নাম্বারটা একটু দিন তো ।”

ম্যানেজার বললেন, “নাগপুর পি.এস. ? ক্যা তকলিফ তুমহারা । হামকো তো বতাইয়ে ।”

বাবলু বলল, “একটু আগে আমরা যখন থেতে বসেছিলাম, তখন একজন লোক ওই সামনের চেয়ারে বসে থেতে-থেতে নজর রাখছিল আমাদের দিকে । লোকটিকে খুব একটা ভাল লোক বলে মনে হচ্ছিল না ।”

ম্যানেজার বললেন, “ব্যস । সময় গিয়া । ও আদমি ভেরি ডেঞ্জারাস । এইসব অঞ্চলের মাফিয়া চক্রের গড়ফাদার ও । আলফানসো আলবুকার্ক । নাগপুর পি. এস. কিছুই করবে না ওর ।

অনেক উচ্চ মহলে ওদের ঘোরাফেরা । ওর পেছনে না লেগে চুপচাপ  
ঘরে পিয়ে শুয়ে পড়ো । ”

বাবলু বলল, “পুলিশ কিছুই করবে না ওর ?”  
“না । ”

বাবলু ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই আলো নিভে  
গেল । কী ব্যাপার ! লোডশেডিং ? না শুধুমাত্র এই লজের ভেতরে  
ছাড়া সবাই আলো ছলছে । কী যে হল ব্যাপারটা, কিছু বুঝে ওঠার  
আগেই মাথায় একটা আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়ল বাবলু । ঘন  
অন্ধকারের ভেতরে জমজমাট হোটেলে তখন দারুণ হট্টগোল ।

একটু পরেই আলো ছলে উঠল । গেটের কাছ থেকে সরে এসে বিলু  
খুঁজতে লাগল বাবলুকে । কিন্তু কোথায় বাবলু ? পঞ্চ মাটি খুকে  
এদিক-ওদিক ছুটেছুটি করতে লাগল ।

তিনতলায় এসে দরজায় নক করে সবাইকে ডেকে বিলু বলল, “বাবলু  
এসেছে ? ”

সবাই সবিস্ময়ে বলল, “না তো !”  
শুরু হল শৌর্জাখুজির পালা ।

বিলু ম্যানেজারকে বলল, “আপনি পুলিশে থবর দিন । আমাদের  
একটি ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে । এই লজের প্রত্যেকটি ঘর সার্চ  
করুন । মনে হয় এখনও সে এইখানেই আছে । কেননা আলো নিভে  
যাওয়ার সময় আমি আমাদের কুকুর নিয়ে গেটের কাছেই ছিলাম ।  
অতএব গেট দিয়ে পালাতে গেলে নিশ্চয়ই সে ধরা পড়ত । ”

ম্যানেজার যথারীতি থানায় ফোন করলেন ।

পুলিশ এল । বিলুর মুখে সব শুনে তোলপাড় করে ফেলল এই  
লজের প্রতিটি ঘর । কিন্তু কোথায় কে ? বাবলুর চিহ্নও নেই কোথাও ।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর আর-এক বিপর্যয় । ওরা দেখল এই  
ডামাডোলের মধ্যে সংযুক্ত উধাও হয়েছে । বোকার মতো মেয়েটা  
দরজা বন্ধ না করে ঘরে বসে ঘর পাহারা দিচ্ছিল । কাজেই কোনওরকম  
বাধা না পেয়েই যারা এসেছিল তারা তাদের কাজ হাসিল করে চলে  
গেছে । বিলু, ভোবল, বাচ্চু, বিস্তু মাথায় হাত দিয়ে বসল । বাবলুর  
১০৪

বাপারে ওরা এমনই উৎকণ্ঠিত হয়েছিল যে, পঞ্চকে ঘরে রাখার কথা  
যেমালই হয়নি কারণ । আসলে একটি অপহরণের ‘পর-মুহূর্তেই’ যে  
আর-একটি অপহরণ হয়ে যাবে, তা কে ভেবেছিল ?

সে-রাত্রি যে কীভাবে কাটল ওদের, তা ওরাই জানে । কেয়া  
নির্বাক । বাচ্চু, বিস্তু ম্যান । বিলু, ভোবলের মুখেও কথা নেই । পঞ্চের  
চেখে জল । সঙ্গে থেকেও সঙ্গছাড়া হওয়ার ফলে কিছুই করতে পারেনি  
বেচারি । তবুও মাঝে-মাঝে একবার করে ঘর থেকে বেরিয়ে  
নীচে-ওপরে টুক্ক দিয়ে আসছে ।

হঠাতে একসময় ছুটতে-ছুটতে এসেই বিলুর প্যান্ট ধরে টানাটানি করতে  
লাগল পঞ্চ । এই ইঙ্গিত ওরা বোঝে । তাই ঘর বন্ধ করে সবাই  
একজোটে পঞ্চের পিছু নিল । একেবারে ছাদের দরজার কাছে এসে  
ভো-ভো করে চিৎকার করতে লাগল পঞ্চ । সেখানে দরজায় তালা  
দেওয়া ।

সকলের মনে হল, তাই তো কাল থেকে ওরা সব কিছু তোলপাড়  
করে ফেললেও এই ছাদে ওঠার কথা তো মনে হয়নি কারণ ।

বিলু তখনই ছুটে গেল ম্যানেজারের ঘরে । বলল, “ছাদে ওঠার  
যে-দরজাটা আছে আপনি একবার গিয়ে সেই দরজার তালা খুলুন । ”

ম্যানেজার বললেন, “ও দরোয়াজা নেহি খুলেগা । চাবি নেহি মেরে  
পাস । ”

বিলু বলল, “দেখুন, আপনার লজ থেকে একটি ছেলে আর মেয়ে  
রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেল । এর পেছনে কি আপনাদের হাত  
নেই বলতে চান ? হ্যাঁ আপনি দরজা খুলবেন, না হলে ও-দরজা ভেঙে  
আমরা ছাদে উঠব । ” বলেই আবার ওপরে উঠে এল বিলু ।

ভোবল বলল, “কী হল ? আসছে ? ”

“না । ওরা আসবে না । বলছে, তালার ন্যাকি চাবি নেই । তালা  
ভাঙ তুই । ”

যা মজবুত তালা, তাকে ভাঙ্গাও এত শক্তা নয় । ওরা হাতের কাছে যা  
পেল তাই দিয়েই টুক্কতে লাগল তালাটাকে । ততক্ষণে ম্যানেজার এবং  
অন্য কর্মচারীরা মারমুখী হয়ে ছুটে এসেছে । যেই না আসা পঞ্চ অমনই

বিকট চিংকার করে বাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। পঞ্চুর চেয়েও দিষ্টগ চিংকার করে পালাল তারা।

বিলু আর ভোঞ্চল সব ছেড়ে ম্যানেজারকে ধরল। দু'জনে দু' দিক থেকে ছুরি ধরল ম্যানেজারের পেটে। আর কুকু পঞ্চু গরগর করতে লাগল।

বিলু বলল, “যদি তাল চাও তো দরজা খোলো। না হলে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। একেবারে কাঁচা থেঁথে ফেলব আমরা।”

ম্যানেজার ডাকলেন, “মোবারক! দরজা খোলো।”

একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

ম্যানেজার বললেন, “ঘাও। সব যাকে দেখো তুমহারা দোষ্ট হ্যায় কি নেহি।”

বিলু বলল, “ঘাদু যে? তুমি আগে ওঠো। তবে তো আমরা ধাব। না হলে আমাদের ছাদে উঠিয়ে তালাটি যদি আবার বন্ধ করে দাও, তথন?”

“আরে বাবা, ঘাও না তুম। হাম তো হ্যায় ছিয়া পর। বহুত কাম হ্যায় হামরা।”

বিলু বলল, “ওঠো বলছি।”

পঞ্চু ডাকল, “ভো।”

অগত্যা উঠতেই হল। সবাই উঠলে পঞ্চু একা রইল সিডির দরজার কাছে পাহারায়। যাতে আর কেউ না ওঠে বা ম্যানেজার নিজেও পালাতে না পারে।

সবাই ছাদে উঠে চারদিক দেখে নিশ্চিন্ত হল। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ একটা চিনের শেড দেওয়া ছেটি ঘরের কাছে এসে বিলু বলল, “এর ভেতরে কী আছে?”

“কুছ নেই।”

এই ঘরের দরজায় অবশ্য তালা দেওয়া ছিল না। শুধুমাত্র শেকেল দেওয়া ছিল।

বিলু শেকেল খুলতেই দেখল এক সুন্দর ও সুন্দী চেহারার যুবক বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে সেই ঘরের ভেতর। যেই না দেখা ম্যানেজার ১০৬

অমনই এক লাফে দরজার কাছে। কিন্তু সেখানে যমের মতো পঞ্চু ছিল পাহারায়। একেবারে গাঁক করে লাফিয়ে পড়ল ম্যানেজারের বুকের ওপর। তারপর এমনভাবে কামড়ে ধৰল যে, যন্দুণায় চিংকার করে উঠল দে।

বিলু আর ভোঞ্চল বন্দিকে মুক্তি দিতেই কেয়া ছুটে গেল তার কাছে, “এ কী, মৈনাকদা! আপনি এখানে?”

“কেয়া, তুই! তুই এখানে কী করে এলি?”

“ভগবান আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমার এই বন্ধুরা নিয়ে এসেছে। সংযুক্তকে সহিমনের কবল থেকে উদ্ধার করেও আবার ওকে হারালাম।”

“আমি আজ কয়েকদিন হল এখানে বন্দি হয়ে আছি। সাইমন-চক্রে আমিও ফেঁসেছি নে। শুধুমাত্র ঝ্যাকমেল করে-করে আমার জীবনটাকে শেষ করে দিল ওরা।”

“আপনাকে তা হলে একটাই সুখবর দিই, সাইমন জাতেরি আর বেঁচে নেই। শুধু দুঃখের কথা এই যে, আলফনসো আলবুকার্কের লোকেরা কাল রাতে আমাদের বাবলুদা ও সংযুক্তকে অপহরণ করেছে।”

“বাবলুদা কে?”

“সব বলব তোমাকে। নীচে এসো।”

বিলু পঞ্চুকে বলল ম্যানেজারকে ছেড়ে দিতে।

পঞ্চু ছেড়ে দিল।

বিলু ম্যানেজারকে বলল, “কী ম্যানেজার সাব? পুলিশ আলবুকার্কের কিছু না করতে পারলেও আপনার নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে?”

মৈনাক চৌধুরী বলল, “থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই। আর ম্যানেজারেও কোনও দোষ নেই। আমরা সবাই আলবুকার্কের খেলার পুতুল। ওকে ছেড়ে দাও। কুকুরে কামড়ানোর ইনজেকশন নিয়ে আসুক।”

বিলু বলল, “ছেড়ে তো দেবই। কিন্তু ওকে বলতে হবে কাল ওদের কোথায় রেখেছিল ওরা। পাচার করেছেই বা কোথায়?”

মৈনাক বলল, “আমি বলছি, তোমরা শোনো। ম্যানেজার কিছু

জানে না । ও শুধু চাকরি করে আর ওপরের নির্দেশমতো কাজ করে যায় । বেচারি সম্পূর্ণ নির্দেশি । যা কিছু জানবার তোমরা আমার মুখেই জেনে নাও । ”

“এই লজ্জটা কার ? এর মালিক কে ?”

“সাহজি । রামটোকে থাকেন । একজন আড়তদার । আলবুকার্কের সোনা পাচার চক্রের একজন । ”

কথা বলতে-বলতেই নীচে নামল ওরা । বিলুদের ঘরে এসে মুখে-চোখে জল দিয়ে চা খেতে-খেতে মৈনাক চৌধুরী যা বলল তা হল এই : আলফানসো আলবুকার্ক আসলে এখানকার লোক নয় । সে একজন গোয়ানিজ । তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ভাবতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দামন, দিউ, দাদরা, নগর হাতেলি ও আঞ্জিডিভ দ্বীপ আগে পতুগিজদের অধীনে ছিল । তখন রাজধানী ছিল নোভা । ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পালামামেট্রের আইনে গোয়া, দামন ও দিউ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর থেকে ভাবতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । যাই হোক, বানাতসির কদম্বরাজের অন্তর্ভুক্ত গোয়া সেকালে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে ছিল । পরে বিজয়নগরে সুলতানরা গোয়ার শাসনভার নেন । ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আলফানসো ডি আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করেন । তখন থেকেই গোয়া পতুগিজদের অধিকারে আসে । এর পর প্রায় ৫০০ বছর তাদের অধিকারে থাকার পর গোয়া এখন স্বাধীন ভাবতের স্বাধীন রাজ্য । আমাদের এই আলবুকার্ক সারাজীবন খুন, জখম, লুঁগতরাজ করে বোবেটের মতো এখানে-ওখানে হানা দিয়ে এখন এক বিরাট চক্রের গড়ফাদার । এটা ওর ছদ্মনাম । কোটি-কোটি টাকার মালিক ও এখন । ভাস্কো-দা-গামাৰ বন্দরে ওর জাহাজ আছে । নিজস্ব প্রেন আছে । পানাজিতে আছে একটা ফাইভ-স্টার হোটেল । সোনা পাচারে সিঙ্কহস্ত । সাইমনের চক্রে এসে আমিও ওর ফাঁদে পড়ে যাই । এখন বাবলু ও সংযুক্তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তোমাদের যেতে হবে গোয়াতে । সে বহুদুরের পথ । কিন্তু সুখানে যাওয়া মানেই নিজেদের অকালমৃত্যুকে ডেকে আনা । তা ছাড়া গোয়ার কোন শহরে কোথায় যে ওদের রাখবে আলবুকার্ক, তা কে জানে ?”

১০৮

বিলু বলল, “তবুও আমরা যাব । কীভাবে কোন পথে যেতে হবে বলুন । বাবলু থাকলে সেই বলে দিত সব । ভাবতের মানচিত্র তার চেতের সামনে ভাসে । কিন্তু আমাদের তো তা নয় । ”

মৈনাক চৌধুরী বলল, “গোয়ায় যেতে গেলে তোমাদের দুটো পথ বেছে নিতে হবে । হয় এখান থেকে বাবে গিয়ে বাবে টু গোয়া । অথবা পুনে গিয়ে সেখান থেকে গোয়া । তবে আমার মনে হয় তোমাদের পুনে দিয়েই যাওয়া ভাল । ”

“পুনে কীভাবে যাব আমরা ?”

“এখান থেকে বোমাইয়ের পথে যে-কোনও ট্রেনে কল্যাণে নেমে পুনে । অথবা এখন ক'টা বাজে ?”

বাঢ়ির হাতে বড়ি ছিল । খড়ি দেখে বলল, “সাড়ে ন'টা । ”

“সাড়ে দশটায় এখন থেকেই কোলহাপুরগামী মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেস ছাড়বে । সেই ট্রেনে চাপলে একেবারে ভোরবেলা পুনেয় পৌছবে । ট্রেনটা মানমাদ থেকে বেঁকে দাউন হয়ে পুনে যায় । ওখানে স্টেশনের কাছেই বাসস্টাড । কোনও অসুবিধে হবে না । আর হোটেলও ওখানে প্রচুর । তবে জায়গা মেলা ভার । তবুও কোথাও যদি না পাও শুক্রবার পেটি-এ হোটেল সরোবরে আমার নাম বললেই ওরা তোমাদের থাকার বাবহু করে দেবে । ”

কেবা বলল, “আপনিও চলুন না মৈনাকদা আমাদের সঙ্গে ?”

“আলফানসো আলবুকার্কের বিরক্তে দীড়বার মতো মেরুদণ্ড আমার নেই । তা ছাড়া তোমরা জানো না বা আমিও জানি না এই মুক্তির পরে পথিবীর মাটিতে পা রেখে চলবার অবিকার আমার কতটুকু । ”

কেবা বলল, “কিন্তু ওরা তোমাকে কেন বন্দি করেছিল মৈনাকদা ?”

“তা আমিও জানি না । এই সংযুক্তার ব্যাপারটা নিয়ে সাইমনের সঙ্গে আমার দারুণ ব্যক্তিগত হত । মেয়েটাকে ও আলবুকার্কের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে । আলবুকার্ক ওকে হয়তো পরে একটা নর্তকী করে তুলবে । এ কী ভাবা যায় ? সেই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম । তারই পরিণাম এই । ”

বিলু বলল, “এখন আপনি কী করবেন এখানে ?”

১০৯

“দেখি না, যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারি, তা হলে বাড়িই চলে যাব।”

“চলুন, তা হলে একসঙ্গেই স্টেশনে যাই। আমরাও তো যাব সাড়ে দশটার ট্রেনে।”

ওরা যখন ওদের জিনিসপত্র নিয়ে লজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, তেমন সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সেখানে।

সবাই আশা নিয়ে ছুটে গেল গাড়ির কাছে। বলল, “কী হল? ওদের কোনও সংবাদ পেলেন?”

ইন্সপেক্টর বললেন, “না।” তারপর ওদের প্রত্যেককে থানায় নিয়ে এসে ধৃত করেকজনকে দেখিয়ে বললেন, “এ সবকো পয়চানা তুমনে?”

বাবলু থাকলে হ্যাতো চিনত। কিন্তু ওরা কাউকেই চিনতে পারল না। তার কারণ ওরা তো দেখেইনি কাউকে। ধৃতদের মধ্যে সাতজি ছিলেন। তাঁর ডান কাঁধে বাস্তেজ। আর ছিল সেই চার ডাকাত। যাথার জঙ্গলে সোনা সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে ওরা। তবে টাকাগুলোর কোনও ইদিস মেলেনি।

থানা থেকে বেরিয়েই ওরা স্টেশনে এল। আর দেরি করলে ট্রেন পাবে না। বার্থ রিজার্ভ করাবার কোনও ব্যাপার নেই। টিকিট কাটো, ট্রেনে ওঠো। বিলুরা কেয়াকে অনেক করে বোঝাল মৈনাকদার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু ও কারও কথা শুনল না। বলল, “যেমন একসঙ্গে এসেছি তেমনই একসঙ্গেই যাব।”

মৈনাক চৌধুরী অবশ্য স্টেশনে এসে কুলি ঠিক করে সাধারণ একটা বগিতে ওদের বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ট্রেন ছাড়ল প্রায় এক ঘণ্টা লেটে। মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেস। কাল সকালে পুনেয় একবার পৌঁছতে পারলে হ্যাঁ।

বাবলু সঙ্গে থাকলে এই যাত্রাটা সত্তিই একটা আনন্দযাত্রা হত। নাসিক, পুনে, এই নামগুলো কতবার শুনেছে বাবলুর মুখে। সিংহগড়ে শিবাজির দুর্গ দেখবার শখ কি ওদের কম? তবু কী করবে। নিরানন্দ হনেও যেতেই হবে ওদের। এখন ভয়, টাকা-পয়সায় কুলোলে হ্যাঁ! ১১০

টাকা-পয়সার জন্য অবশ্য খুব একটা চিন্তা করে না ওরা। কম পড়ে গেলে যে-কোনও একটা হোটেলে উঠে বাড়িতে ফেন করলেই টি.এম.ও-তে টাকা এসে যাবে। তবু বাবলু ছাড়া পাওয়া গোয়েন্দা মানেই গার্ডবিহীন ট্রেন।

মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেস বিদ্রোহ মাটি কাপিয়ে ছুটে চলেছে। ওয়াধা, বদনেরা, আকেলা। একের পর এক স্টেশন পার হচ্ছে। সর্কেবেল ভূসাওয়াল এল। এখানে আসতেই অর্ধেক ফাঁকা হয়ে গেল গাড়ি। মুখোযুবি দুটো বাঙ্ক ভাগাভাগি করে নিল ওরা। একটাতে শুয়ে পড়ল বাচ্চ, বিচ্ছু। আর-একটাতে কেয়া। বিলু, ভোঁধল শুয়ে পড়ল মুখোযুবি সিটে। আর পঞ্চ শুল নীচে।

এরপর মানমাদ। এইখান থেকে সোজা পথটা চলে গেছে বেথাইয়ের দিকে আর বাঁকা পথটা গেছে আহমেদনগর হয়ে দাউন্ড, পুনে, সাতারা, সাংগলি, মিরাজ ছুয়ে কোলহাপুর। ওরা অবশ্য পুনেয় নামবে।

পুনে এল পরদিন সকাল সাতটায়। ছুটা চালিশে পৌছবার কথা। কুড়ি মিনিট লেট। স্টেশন থেকে বেরিয়েই ওরা ধাধিয়ে গেল। মন্ত শহর। কিন্তু মুশকিল হল, কোথাও কোনও হোটেলেই জায়গা নেই। হোটেল, লজ সব ভর্তি। হবে নাই-বা কেন? পুনে হচ্ছে শিবাজির দেশ। ‘কুইন অব ডেকান’। কেউ-কেউ বলেন, প্রাচীন দণ্ডকারণা ছিল এইখানেই। একসময় এখানে বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রাধান্য ছিল। পরে চানুকা, রাষ্ট্রকৃত ও যাদববংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্র-বিন-তুঘলক এবং এর পর বাহমনিদের হ্যাত ঘুরে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে মরাঠাদের হাতে চলে যাব।

ওদের কাছে ‘হোটেল সরোবর’-এর ঠিকানা ছিল। তাই ওরা সেখানে গিয়ে শাজির হতেই ঘর পেয়ে গেল। চার্জও এমন কিছু নয়। মাত্র চালিশ টাকায় বড় একটা ঘর। তবে কমন বাথ। তা হোক, একবেলা তো থাকা। বাত্রি হলেই রওনা হবে গোয়ার পথে।

এখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে মৈনাক চৌধুরীর খাতির ছিল। তাই সব শুনে বললেন, “তোমরা ত্রুটা একটু ভুল করলে। আমি বিল কেটে

ফেলেছি । আর কিছু করা যাবে না । এইরকম অবস্থায় তোমাদের উচিত ছিল স্টেশনের ক্লোকরুমে মালপত্র রেখে কন্ডাকটেড ট্যারে শহর দেখে রাতের বাসে গোয়া চলে যাওয়া । অথবা চলিশটা টাকা গেল ।”

বিলু বলল, “আমাদের মালপত্রই বা কোথায় ? কাজেই ক্লোকরুমে রাখারও কোনও দরকার ছিল না । এই কাঁধে বোল নিয়েই ঘুরতে পারতাম আমরা । যাই হোক, আমরা একটু স্নানপর্ব তো সেরে নিতে পারব ।”

ওরা আর একটুও সময় নষ্ট না করে স্নানের পাট চুকিয়ে বাইরে বেরোল । একটা দোকানে ঢুকে সামান্য একটু নাস্তা সেরে চা খেল প্রত্যেকে এক কাপ করে । বিচ্ছু ওর চা থেকে একটু চা ডিশে ঢেলে পঞ্চকে যাওয়াতেই হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল দোকানদার । অর্থাৎ কুকুরের এঁটো ডিশে এর পরে মানুষকে সে চা দেবে কেমন করে ?

ওরা চা খেয়ে সোজা পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে আবার স্টেশনের দিকে এল । এইখানেই বড় বাসস্ট্যান্ড । কত জাহাগর কত বাস যে ছাড়ে এখান থেকে, তার যেন ঠিক নেই । শোলাপুর, কোলহাপুর, নাসিক, সিরডি, জলগাঁও, মুখাই, বেলগাঁও, গোয়া । ওরা গোয়ার কাউন্টারে গিয়ে টিকিট চাইতেই উত্তর এল, “কাহাঁ যাওগে তুম ? মনগাঁও, পানজিম ?”

বিলু বলল, “গোয়া ।”

“আরে বাবা সবই তো গোয়া । ঠিক হ্যায়, তুম পানজিমকা টিকিট লে লো ।”

বিলু পঞ্চকে দেখিয়ে বলল, “এও যাবে ।”

“উসকো ভি টিকিট লাগেগা । এক পুরা টিকিট । লেকিন সিট নেই মিলেগা ।”

বিলু বলল, “তা হলেই হবে । কখন ছাড়বে বাস ?”

“সামকে আট বাজে । তুম সাত বাজে হিয়া চলা আও ।”

ওরা বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে ঠিক করল শিবাজির দুর্গ সিংহগড়টা গিয়ে একবার দেখে আসে । কী করবে । ভূমণ যতই বিয়াদের হোক, সময় তো কটাতে হবে ! কিন্তু খৌজখবর নিয়ে জানল, সিংহগড়ের বাস এখন নেই । এখান থেকে দূরত চারিশ ক্লিলোমিটার । কাজেই

অটোতেও ভাড়া লাগবে অনেক । তাই এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে এক জায়গায় এসে শুনতে পেল একটা সুন্দর বাকবকে বাসের কন্ডাটর হৈকে চলেছে, “নগর দর্শন ! নগর দর্শন ! হ্যায় কোদি ?”

ওরা ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “নগর দর্শন কী ভাই ?”

“আরে বাবা, ট্যারিস্ট বাস । দশ রূপিয়া ভাড়া লাগেগা । শানওয়ার ওয়াখা, কেলকুব মুজিয়ম, সব কুছ দিখায়েগা । পুরা তিন ঘণ্টে কা সফর ।”

ওর হইহই করে উঠে পড়ল বাসে । না-ই হোক সিংহগড় । শহরটা তো দেখা হোক । ফেরবার সময় বরং বাবু সঙ্গে থাকলে ঘুরে দেখবে সব । দেখতে তখন ভালও লাগবে । আর ওই সোনাভালা, কারলা, ভাজা, কী সব যেন আছে ?

বাস ছাড়তেই সরকারি গাইত্তি আধা হিন্দি, আধা মরাঠিতে যা বলল, তা হল এই: “মুলা ও মুখা এই দুই নদীর সঙ্গম আছে এই পুনেতে । শিবাজির স্মৃতিবিজড়িত শহর । পুনের উত্তরে শিবনেরি দুর্গে শিবাজির জন্ম হয় এবং শিবাজির শৈশব কাটে পুনেয়ে । যে-পাহাড়ে শিবাজির জন্ম হয় সেখানে পঞ্চাশটি বৌকগুহ্য আছে । দেবগিরির যাদব বাজারা সেই দুর্গ ব্যবহার করতেন । শহর থেকে তিন ক্লিলোমিটার দূরে একটি ছোট পাহাড়ে পার্বতী মন্দির আছে । সেই পাহাড়ে ওঠার একশে অটো সিডি । এই বাস পাহাড়ে ওঠার সময় দিতে পারবে না । তবে পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাস নিয়ে যাবে । শিবাজি পার্ক, চিড়িয়াখানা, এইসব দেখাবে ।”

যাই হোক, বাসে যেতে-যেতে ওরা একটা জিনিস লক্ষ করল, সেটা হল এখানকার রাস্তাঘাটের নাম । আমাদের হাঁওড়া, কলকাতার মতো লেন-টেন কিছু চোখে পড়ল না । তার বদলে শনিবার পেট, রবিবার পেট ইত্যাদি । কেউ-কেউ পেট-কে পেথও বলছে । পথ থেকেই কি পেথ ? হ্যাতো ।

যাই হোক, প্রথমেই ওরা এল শানওয়ার ওয়াখা (শনিবারওয়াড়া) । পুনের শেষ পেশোয়ার পিতামহ বাজিরাও এইখানে এক দুর্গের মতো প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন । ১৮২৭ সালের এক শনিবার এই প্রাসাদ

বিশ্বস্তী অপ্রিকাণ্ডে ধ্বংস হয়। সেই ধ্বংসস্থৃপ্তাই ওরা দেখল। এর দুর্ঘার হাতি লাগিয়েও যাতে খোলা সন্তুষ্ট না হয় সেজনো লোহার গজাল আছে দরজায়। দরজার কাছে একটি ছোট ব্যালকনিতে কিছু ফ্রেঞ্চ চিত্রও আছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে পেশোয়া মাধ্যেরাও নারায়ণ এইখানে পড়ে গিয়ে মারা যান। এখানকার মাটি খুঁড়ে সুন্দর একটি উদ্যানের অস্তিত্বও আবিকার করা হয়েছে। এর পর ওরা শিবাজি পার্ক হয়ে কেলকর মিউজিয়াম দেখে চলে গেল আগ্যা থান প্রাসাদে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহায়া গাঞ্জী এইখানেই বন্দি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী কন্তুরবা তখনই মারা যান। কন্তুরবার সমাধিও এখানে আছে।

বেলা বারোটার মধ্যেই ওরা ফিরে এল যথাস্থানে। তারপর একটা হেটেলে থেয়েদেয়ে লজে এসে ঝোলাবুলি যা ছিল, সঙ্গে নিয়ে চলল পুনের বিখ্যাত পার্বতী মন্দির দেখতে। বাবলুকে উক্তার করতে যাওয়ার আগে দেবীদর্শন তো করা উচিত। শুধু বাবলু নয়, সংযুক্তাও আছে। মানিচয়ই তাঁর প্রভাবে একটি মেয়ের অবসাননা হতে দেবেন না। দু'জনকেই রক্ষা করবেন।

রাত অট্টায় বাস। এখন সবে দুপুর দুটো। অটোয় চেপে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ফুলমালা ইত্যাদি কিনে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল ওরা। চী সুন্দর দৃশ্য চারদিকে! এই পাহাড়টা যেন পুনের মনুমেন্ট। পটে আঁকা ছবির মতো দৃশ্য চারদিকে। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়ের রেখা। আর নীচে সুসজ্জিত ঘরবাড়ি।

দুপুরে এখন নির্জন পাহাড়। মন্দির পর্যন্ত যেতে হল না ওদের। কয়েক ধাপ ওঠবার পর অর্ধপথেই মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। পপু বিকট একটা চিংকার করে লাফিয়ে উঠল, “আঁ-আঁ-আঁড়ি-উ-উ।” আতঙ্কের কালো একটা মেঘ ধীরে-ধীরে যেন যানিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

“ভাঙ্গো। ভাঙ্গো। ভাঙ্গো।” একটানা একটা কঠসুর ক্রমাগত কানের কাছে বাজতে লাগল ব্যাবলু। মাথাটা এখনও বিমর্শিম করছে। ও এখন কোথায়? কীভাবে এখানে এল? কিছুই মনে করতে পারল না। গা, হাত, পায়ে অসহ্য ব্যথা। অঙ্কুর একটা ঘরে শুয়ে ছিল ও। একটু-একটু করে ওঠবার চেষ্টা করল। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ঘর। নীচের মেখেটাও কাঠের। তার দোতলা অথবা তিনতলার ঘরে বলি হয়ে আছে ও। উঠে গিয়ে দরজাটা টেনে খোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যথা চেষ্টা। সেটা বাইরে থেকে বন্ধ। মাথার ওপরে টলির শেষ। তার মানে এর ওপরে আর কোনও ঘর নেই। জানলার কাঠ খুঁড়ে সূর্যের আলো আসছে। এখন তা হলে দিন। পকেট হাতড়ে দেখল টাকা-পয়সা, পিণ্ডল কিছুই নেই ওর কাছে। মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

এমন সময় দরজার কাছে খুট্টাটি শব্দ হতেই ও ব্যাল তালা খুলে ঘরে ঢুকছে কেউ। ব্যাবলু যেমন ছিল তেমনই এসে আবার শুয়ে পড়ল। শুধু শুয়ে পড়া নয়, একেবারে সংজ্ঞায়িন হয়ে থাকার ভাবে করল। চোখ পিটিপিটিয়ে দেখল একজন দীর্ঘকায় লোক বিচ্ছিন্ন ধরনের টুপি মাথায় দিয়ে ঢুকল। তারপর টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট, চা ইত্যাদি রেখে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ঘরের লাগোয়া বাথরুম। ব্যাবলু সেখানে মুখ, হাত ধুয়ে খাবারের প্লেটে হাত দিল। গোটাকতক টোস্ট, ওমলেট আর কলা রয়েছে সেখানে। প্রচণ্ড খিদের মুখে ব্যাবলু গোওাসে থেতে লাগল সেগুলো। সবে আধখাওয়া হয়েছে অননই আবার খুলে গেল দরজাটা।

সেই দীর্ঘ লোক ঘরে ঢুকে দাঁত বের করে হেসে বলল, “মুরো মালুম থা তুম ইঁশ মে হো।” বলেই আবার সশ্রদ্ধে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

ব্যাবলু কোনওরকমে যাওয়া শেষ করল। টোস্টের পর গরম চা মন্দ লাগল না। চায়ের স্বাদও ভাল। থেয়েদেয়ে গোটা ঘর তোলপাড় করল ব্যাবলু। ভাগ্য ভাল যে, হাত-পা মেঘে রাখেনি। ফলে আর যাই হোক,

বরময় ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতটি আছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সাহেবি প্যাটার্নের টালি। ভেঙে বেরনো যাবে। একটু উচুতে যদিও, তবু টেবিলের ওপর চেয়ার বসিয়ে নাগাল পাবে। বিলুরা এখন কী করছে কে জানে? ওরা কি নাগপুরেই আছে? কেয়া, সংযুক্ত, ওরা কোথায়? সংযুক্তটা বড় অভিমানী। তবে এটা ঠিক, বাবলুর ওকে চড় মারটা উচিত হয়নি। ও তো বাবলুকে বিপদে ফেলবে বলে চেয়ানি। বেচারি ভয় পেয়েই চেঁচিয়েছিল।

“ভাস্কো! ভাস্কো! ভাস্কো! ভাস্কো!” অনেক লোকের একটানা কঠিন অস্পষ্টভাবে আবার শুনতে পেল বাবলু। ভাস্কেটা কী? কেউ বলছে ভাস্কো, কেউ বাস্কো। দেখতে হচ্ছে। কেননা ও নিজেও বুঝতে পারছে না, কোথায় আছে ও। ঘরের ভেতর একটি-ও দিক তাকাতেই এক জায়গায় একটা ভাঙ্গা পেপারওয়েট দেখতে পেল। সেটা কুড়িয়ে জানলার কাছে মারতেই বানবন শব্দে ভেঙে পড়ল কাটটা। বাইরের কঠিন আরও প্রকট হয়ে উঠল। ভাস্কো, ভাস্কো, ভাস্কো, ভাস্কো। বাবলু উকি মেরে দেখল বাইরে চারদিকে গগনচূড়ী অট্টলিকা। সব বাড়িরই মাথায় টালির শেড। সেইসব বাড়ির স্থাপত্যও অন্যরকমের। কাছেই একটা বাস্টার্ড। সেখানে সারি-সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। তারই কভটিরণা বাসের পিঠ চাপড়ে অনবরত হৈকে চলেছে—“ভাস্কো, ভাস্কো, ভাস্কো...।” বাসের মাথায় ইঁরেজি হুকে লেখা আছে—‘ভাস্কো-দা-গামা’। তার মানে? তার মানে কী! ও কি তবে গোয়ায়! এই মৃত্যুপূরীতে থেকেও আনন্দের উচ্ছ্বসে ওর বুকের ভেতরটা ছলাত করে উঠল। যেভাবেই হোক, মৃত্যি ওকে পেতেই হবে। ওর স্বপ্নের গোয়ায় পাহাড়ে, সমুদ্রে অবাধে ঘুরবে ও। কিন্তু ও এখন কোথায়? বাস তো যাচ্ছে ভাস্কোয়। এটা তো ভাস্কো নয়। জানলা সিল করা। তাই অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারল না। এবার চায়ের কাপটা ছুড়ে আবার একটা কাচ ভাঙ্গল। তারপর চেয়ারটা টেনে এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা কাচের ফাঁক দিয়ে দেখল, এক জায়গায় বড়-বড় হুকে লেখা আছে—‘পানজি’। অর্থাৎ গোয়ার রাজধানী। এর পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্বে ও পশ্চিমে কন্টিক।

কোক্ষন উপকূলে এই গোয়ার প্রাচীন নাম গোমস্তক। রামায়ণ-মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। পরশুরাম সমুদ্রে তাঁর কুঠার নিকেপ করতেই সমুদ্র সরে গিয়ে এই গোমস্তক প্রদেশ তাঁর শিয়দের বাসের জন্য হেঢ়ে দিয়েছিল। বিহুতের আর্য সারপ্ত গ্রান্থগুলি এখানে বাস করেছেন। কদম্বরাজগুলি করেছেন রাজত্ব। গোয়ার রাজধানী তখন চন্দ্রপুর। বিজাপুরের সুলতানগুলি এখানে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মুসলমান অধিকারে লোকে এইখান থেকেই মকায় যেত। বিজাপুরের আদিল শাহ তাঁর রাজধানী যখন গোয়ায় স্থানান্তরিত করবেন প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন, তেমন সময় পর্তুগিজ আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করেন। আদিল শাহ অবশ্য এখানে ছিলেন না তখন। তবে ফিরে এসে তিনি পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দেন। এর আট মাস পরে অবশ্য যে ভয়কর যুদ্ধ হয়, তাতেই পর্তুগিজগুরা পাকাপাকি গোয়া অধিকার করে। যোড়শ শতকে গোয়ার চৰম উন্নতি হয়েছিল। লোকে বলত ‘গোল্ডেন গোয়া’। গোয়া দেখলে আর পর্তুগালের রাজধানী লিসবন দেখার দরকার নেই। পর্তুগিজ আলবুকার্ক গোয়ার মাটিতে এক নতুন দেশের জন্ম দিয়েছিলেন। সে-দেশ আজও নতুন। তারতের মাটিতে এক বহিভরিতের স্থাপত্য নির্মাণ করে গেছে পর্তুগিজগু। গোয়া-পর্তুগিজ-আলবুকার্ক। আলবুকার্ক-পর্তুগিজ-গোয়া। কাল নাগপুরের লজে বাবলু তা হলে ঠিক লোককেই দেখেছিল। এক বৃহদাকার শকুন-চক্ষু গোয়ানিজ। আলফানসো ডি আলবুকার্কের নাম নিয়ে, যে কিনা সোনার দেশ থেকে সোনাকে পাচার করে দিছে। কিন্তু বাবলুকে কেন সে ধরে আনল এখানে? তার উদ্দেশ্য কী? বাবলু আর যেন মাথার ঠিক রাখতে পারল না। সে চিংকার করে উঠল, “আই হেট ইউ আলবুকার্ক। অই হেট ইউ। তৃষ্ণি একবার আমার সামনে এসো। তোমার চোখ দুটো আমি উপড়ে নিই। তোমার কালো রঙের গোয়ার বিচ আমি ভিজিয়ে দিই। আলফানসো! আই মাস্ট ডু ইট।”

সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আর দু’জন গোয়ানিজ এসে কোক্ষনি ভায়ায় ওকে ভীষণভাবে ধমকে গেল। বাবলু কিছুই বুঝল না ওদের কথা। তবে একজন শুধু মাওয়ার আগে বলে গেল, “চেজাও মাত।”

বাবলু উত্তেজিত হয়েই টেঁচিয়েছিল। এখন বুবল চিৎকার, চেচামেচি নয়। এইসব করলে যদি ওরা বেঁধে রাখে, তা হলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। যত কষ্টই হোক, এই দীর্ঘ দিনটা দৈর্ঘ্য ধরে কঠিতেই হবে ওকে। তারপর সকে হলেই চেষ্টা করতে হবে পালাবার। তাতে একটা জায়গায় দুটো, দুটোর জায়গায় চারটে খুন করতেও পিছপা হবে না। যেভাবেই হোক, ওর টাকা-পয়সা এবং পিস্তলটাকেও উদ্ধার করতে হবে। এইসব ভাবতে-ভাবতেই ও এদিক-সেদিক থেকে কয়েকটা হাতিয়ার জেগাড় করে ফেলল। একটা মরচে-ধরা ছোরা, একটা হাতুড়িও পেল।

হঠৎ ওর কানে এল, “উ, উ, উ, উ!” কে যেন কাঁদছে। কোথা থেকে আসছে কামার শ্বর? সন্তুষ্ট পাশের ঘরেই আছে কেউ। মেঝে গলার কানা। সেও কি বন্দিনী! হোক। আর কারও ভাল করতে গিয়ে নিজের বিপদ বাড়াবে না। সংযুক্ত ওকে যা শিক্ষা দিয়েছে!

এমন সময় একটা কড়া গলার ধমক শোনা গেল, “জোও মাত, খানা যা নো।”

উভয়ে একটা ঝাঁঝালো প্রতিবাদ শোনা গেল, “না, খাব না। দূর ই।”

“ঘর কি চিন্তা মাত করো লালি। খানা তুমকো খাবেছি পড়েগা।”

দরজা দুর করে বক হয়ে গেল এবং তারপরে তালা দেওয়ার শব্দও শোনা গেল।

বাবলুর মনে হল, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না তো? এসব কী হচ্ছে? এ কঠিন কার? সংযুক্ত এখানে কী করে এল? তবে কি ওদের সবাইকেই নিয়ে এসেছে ওরা? বিলুরাও কি ওই ঘরে আছে? পঞ্চ! পঞ্চ কোথায়?

বাবলু আর হিঁর রাখতে পারল না নিজেকে। এই ঘরের দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে টেবিলটাকে পাটিশানের কাছে টেনে আনল। তার ওপরে চেয়ার রেখে উঠে দীঢ়াতেই দেখতে পেল, পাশের ঘরে একটি লোহার খাতে হুমড়ি খেয়ে ফুপিয়ে-ফুপিয়ে কৌদছে একটি মেয়ে।

বাবলু চাপা গলায় ডাকল, “সংযুক্তা!”

১১৮

সংযুক্তা চমকে উঠল। কানা থামিয়ে উঠে বসেই বলল, “কে! কে তুমি?”

“আমি বাবলু। এই যে, এইদিকে।”

সংযুক্তা ছুটে এল বাবলুর দিকে, “তুমি এখানে কী করে এলে?”

“তুমি কী করে এলে? ওরা কোথায়?”

“জানি না।”

“ঠিক আছে। আমার কথা শোনো। এদের অবাধা হয়ো না। সকের পর যেভাবেই হোক পালাব এখান থেকে।”

“আমি? আমাকে নিয়ে যাবে তো?”

“তুমি তো ঠিক সময়েই টেঁচিয়ে উঠবে।”

“আর চোব না। কথা দিলাম। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ো। লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি।”

বাবলু হেসে বলল, “তব নেই। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না।”

এরপর সারাটা দিন যে কীভাবে কাটল, তা ওরাই জানে। বাবলুর মনে হল পৃথিবীর ইতিহাসে এই দিনটাই বোধ হয় দীর্ঘতম দিন। কিন্তু এ কী! বিকেল গড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই গোয়াও ঢলে পড়ল যে! সারাদিনের সেই প্রাণচক্রলতা কোথায় গেল? একেবারে বিমিয়ে নেতিয়ে পড়ল এত বড় শহরটা। রাত বাড়তে লাগল একটু-একটু করে।

বাহিরে চারের ঘড়িতে রাত নটা বাজল। পথঘাটি জনহীন। যে-লোকটা সকালে, দুপুরে খাবার দিতে এসেছিল, সে আবার খাবার দিতে এল। হাতুড়িটা হাতের কাছেই রেখেছিল বাবলু। লোকটা খাবার দিয়ে পিছু ফিরলেই ওর ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু যে-অবহায় টলতে টলতে চুকল লোকটা, তাতে সেসব কিছুই করবার দ্রব্যকার হবে নলে মনে হল না। বাবলু বুঝল লোকটা ভীষণ নেশা করেছে। তার মানে, এই এখনকার অবস্থা। এখানে সবাই এখন নেশাছেন।

লোকটা চুক্তেই বাবলু বলল, “ক্যা লায়া হো?”

“খানা। খানা খাওগে তুম।”

“নেহি খায়গা।”

“খানা হি পড়েগা। নেহি তো ও লোক মারেগা হামকে।”

১১৯

বাবলু বলল, “আমি থাকতে কে মারবে তোমায় ? আলবুকার্ক ?”  
লোকটি একটা হিকু তুলল। গালাগালি দিল।

বাবলু বলল, “তুমি এক কাজ করো, আমার খানটা খেয়ে নিয়ে এই  
বিছানায় শয়ে পড়ো। আর চাবিটা দাও, পাশের ঘরের মেয়েটাকে  
আমিহি খানা খাইয়ে আসছি।”

“তো যাও। ইয়ে লো চাবি। হাম খানা খায়গা, গানা গায়ে গা,  
অডির শোয়েগা। তুম হামারা কাম করো। এভি  
নাইট—ইজ-ইজ-ইজ।”

বাবলু ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে শেকল তুলেই পাশের ঘরের দরজা  
খুলেছে। সংযুক্ত ছটফট করছিল। দরজা খুলতেই বেরিয়ে এল ও।  
ওর চোখমুখের ভাব দেখে মনেই হল না, ও সেই নিরীহ মেয়েটি। এই  
দু'দিনেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর। এখন ওকে দেখলেই মনে হয়  
যে-কোনও লড়াইয়ের জন্মই ও প্রস্তুত।

ওরা দু'জনে পা টিপে-টিপে যখন ওপর থেকে নীচে এল, তখন  
দেখল, একদল লোক একটি ঘরের ভেতর আছেন হয়ে বসে আছে।  
অর্থাৎ কারও কোনও হুশ নেই। এই হচ্ছে গোয়া। এটা একটা  
ছেটখাটো বার-কাম-লজ বলেই মনে হয়। একজন লোক কাশের কাছে  
বসে কী যেন হিসেব করছে। বাবলু চুপিচুপি পেছন দিক দিয়ে গিয়েই  
লোকটার মাথার ওপর বসিয়ে দিল হাতুড়ির এক ঘা। লোকটা একবার  
অঁক করে উঠল। তারপর বসে পড়ল সেখানেই। ক্যাশে টাকা-পয়সা  
যা ছিল, তা টেনে বের করতে গিয়েই ঠক করে কী যেন একটা পড়ে  
গেল। বাবলু হেঁট হয়ে দেখল, ওর পিস্তলটা। সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে  
ভেতরটা খুলতেই দেখল সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। শুধু টাকা-পয়সা  
বাখার মানিবাগটাই যা নেই। অবশ্য কত টাকা যে ছিল তাতে, তাও  
মনে নেই ওর। সে যাক গে। আপাতত এখন থেকে হাজারখানেক  
টাকা নিয়ে নিলেই কাজ চলে যাবে। টাকাগুলো পকেটে বাখতে গিয়েও  
কী যেন মনে হল ওর। এটা, ওটা, সেটা টেনেটুনে দেখতে-দেখতে  
হঠাৎ পেয়ে গেল ওর মানিবাগটা। খুলে দেখল শপাঁচেক টাকা ও  
যুচরো কিছু ঠিকই আছে। কাশের টাকা ক্যাশেই রেখে যেই না বেরোতে

যাবে অমনই দরজায় টকটক শব্দ। সংযুক্তা ও বাবলু দু'জনেই সবে গেল  
দরজার পাশে। বাবলু আস্তে করে ছিটকিনিটা খুলে দিতেই নিখে  
চেহারার চারজন লোক থেরে চুকল। বাবলুর দিকে বক্তৃত্বে তাকিয়ে  
বলল, “ও বাস্তালি হোকরা কিধার হ্যায়।”

বাবলু বলল, “এক লেড়িকি ভি হ্যায়। উপরমে।”

লোকগুলো মসমস করে এগিয়ে যেতেই বাবলু সংযুক্তাকে টেনে  
আনল বাহিরে। তারপর দরজার কাছ থেকে হেঁকে বলল, “সাব ! ওনলি  
ওয়ান মিনিট। ও লেড়িকা মায় হু। অডির ইয়ে হ্যায় ও লেড়িকি।”  
বলেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে ডের-বোল্টা টেনে দিল।

লোকগুলো তখন ভাবী কাঠের পালার ওপর সগর্জনে ঝাপিয়ে  
পড়েছে।

বাবলুরাও তখন এক লাফে রাস্তায়। তারপর  
দৌড়—দৌড়—দৌড়।

নিমুম, নিমুজ পানাজি তখন আলোয় বালমল করছে। একপাশে  
প্রশংস রাজপথের গা ধৈয়ে বয়ে চলেছে প্রবল-প্রবাহ মাণবী।

রাস্তার ডান দিকে নদী। বাঁ দিকে প্রাসাদমালা। একদিকে  
আলটিনহে পাহাড়। কিছুদূর যাওয়ার পরই ওরা খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে  
ছেটা থামাল। এক জায়গায় একটি বিশাল শ্রোঢ় স্টাচুর কাছে এসে  
বসে পড়ল ওরা।

সংযুক্তা পাহাড় দেখেনি কখনও। নদী দেখেনি। তার ওপর  
এইরকম দেশ ! এ তো ওর কলানারও বাহিরে। তাই সেই মৃত্তিটার দিকে  
তাকিয়ে বলল, “এটা কী ঠাকুর ?”

বাবলু স্টাচুর নীচের লেবা পড়ে বলল, “এটা ঠাকুর নয়। আরে  
কেরিয়ার স্টাচু। ইনি ছিলেন গোয়াবাসী পাদ্রি এবং ইনিই পৃথিবীতে  
প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রথায় হিপোচিজম চালু করেন।”

খানিকক্ষণ বসে একটু জিরিয়ে ওরা পথ-চনা শুরু করল। এখন  
একটা মেয়েকে নিয়ে রাস্তাঘাটে ঘোরাও ঠিক নয়। এখানে  
হোটেল-লজই বা যে কোথায়, তা কে জানে ? লোকজন কম থাকলেও  
কিছু পুলিশ অবশ্য ঘোরাফেরা করছে রাস্তায়। কিন্তু পুলিশের কাছে

গেলেই বা এখন কী সাহায্য পাবে ওরা ? পুনিশও রাতের পানাজিমে এখন প্রকৃতিস্থ আছে কি ? ওরা মাওবী নদীর ধারে এক জায়গায় বড়-বড় কয়েকটি ঢেনু পাইপ দেখতে পেয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল । একদল ভব্যরে শুয়ে ছিল আশপাশেই । ওরা সেইখানেই একটি কংক্রিটের বড় পাইপের ভেতর ঢুকে বসে রইল । বাবলুর বুকে এখন একটুও ভয় নেই । ওর মানিখাগে আছে টাকা । পিস্তলে আছে বুলেট । জায়গাটা পরিত্বক্ত হলেও নিরাপদ । শত্রুপুরীর মুখশয়ার চেয়েও মুক্ত প্রাপ্তি চাঁদের আলো অনেক বেশি ভাল ।

একটা রাত দেখতে-দেখতেই কেটে গেল । পরদিন সকালে সূর্যের আলো সরাসরি ওদের মুখে এসে পড়লে ঘূম ভেঙে গেল দুঁজনের । সারাবাত জেগে থাকতে-থাকতে ভোরের দিকেই ঘূমিয়ে পড়েছিল । এখানে অপ্যাস্ত জল । একটা কলে মুখ ধূয়ে ফেরিয়াটের কাছে একটা দেৱকনে বসে কেক আৰ কফি খেল ওৱা ।

প্রবল-প্রবাহ মাওবী আৰৰ সাগৱের দিকে বয়ে চলেছে । কী দারুণ চওড়া নদীটা । বাবলুৰ মনে হল যেন ভৱিতের বাইরের কোনও এক দেশে চলে এসেছে ।

সংযুক্তি বলল, “নদীৰ ওপারে কত বড় একটা পাহাড় দেখেছ ? আমাৰ খুব উঠতে ইচ্ছে কৰছে । যাৰ একবাৰ ?”

বাবলুৰও ইচ্ছে হচ্ছিল খুব । এমন সুন্দৰ নীল জলের নদী । এমন সুন্দৰ লক্ষ । লক্ষ তো নয়, যেন ছেটখাটো একটা ছাদবিহীন জাহাজ । মোটিৰ পৰ্যন্ত ওপারে যাচ্ছে লক্ষে চেপে । কিছু দূৰে নদীৰ ওপৰ একটা সেতু তৈৰি হচ্ছে দেখতে পেল । কিন্তু লক্ষে ওঠবাৰ টিকিটঘৰ কোথাও দেখতে পেল না । একজনকে জিজ্ঞেস কৰে জানল, এখানে লক্ষে পারাপারেৰ কোনও পয়সা লাগে না । সৰ্বসাধাৰণেৰ জন্য ফ্ৰি-সার্ভিস । আৰ ওদেৰ পায় কে ? দিবি সাহেব-সুবোদেৰ সঙ্গে মাওবীৰ বুকে জলদস্তি কৰে নিল ।

ওগৱ থেকে এপোৱে এসেই দেখল শহৰ পুৱেদমে মেতে উঠেছে তখন । অনবৱত বাস যাচ্ছে । মোটিৰ যাচ্ছে । বিচিৰ টুপি ও হাঁটু ওপৰ শাড়ি-পৰা গোয়ানিজ মেয়েৱাৰ পথেঘাটে ঘূৰছে । একটা বাস

অনবৱত হাঁকছে, “দোনা পাওলা । দোনা পাওলা ।” বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস কৰল, “দোনা পাওলা কী ?”

উভয়ে লোকটি বলল, “তুম বসালি ? টুরিস্ট ?”

“জি হ্যাঁ ।”

“তো দোনা পাওলা চলা যাও । উধাৰ সমুদ্র মিলেগা । দশ মিনিট কা রাস্তা । বাস পাকড়ো ওৱ চলা যাও । এক কুপিয়া ভাড়া লাগে গা ।”

ওৱা সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাসে উঠে দোনা পাওলায় চলে এল । এক পতুগিজ বৰষী এইখানকৰ সমুদ্রে আঞ্চলিক দিয়েছিলেন । তাঁৰই নামানুসারে এই জায়গার নাম ‘দোনা পাওলা’ । এটি একটি টুরিস্ট স্পট । এখানটা যেমন সাজালো-গোছালো, তেমনই এখানে দেকানপত্রেৰ বহুৱ । কত রকমাৰি মালা, সামুদ্রিক জিনিসপত্ৰ বিক্ৰি হচ্ছে এখানে ।

বাবলু পছন্দসই কয়েকটি মালা সংযুক্তকে উপহাৰ দিল । তাৰপৰ দুঁজনেৰ জন্য দুটো টুপি কিনে পৰতেই চেহাৰা পালটে গেল দুঁজনেৰ । এইখানে একটা ছোট পাহাড়ৰে ওপৰ উঠে বহুদূৰেৰ দৃশ্যা দেখল । এখানে শুধু পাহাড় আৰ সমুদ্ৰ । এই তো দেখাৰ ।

দোনা পাওলা থেকে ফিরে আৰৰ মাওবী । আৰৰ উদ্দেশ্যাবীনভাৱে পথ চলা । হাঁটাএ এক জায়গায় এসে থককে দাঁড়াল ওৱা । দেখল বড়-বড় কৱে লেখা আছে ‘গোয়া ট্যুরিজম ডিভেলপমেন্ট কোৰ্পোৱেশন’ । পাশাপাশি দুটো বাসও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে । একটা সাউথ গোয়া যাবে । একটা নৰ্থ গোয়া ।

বাবলু সংযুক্তকে বলল, “শোনো, আমৱা এইভাৱে ঘূৰে না বেড়িয়ে বৱং যে-কোনও একটা বাসে চেপে গোয়াটা সারদিনে ঘূৰে নিই । তাৰপৰ বিকেলে কোনও একটা হোটেলে উঠে পৱেৰ ব্যাপারটা চিন্তা কৰব ।”

যাকে বলা সে তো এককথায় রাজি ।

ওৱা কাউন্টাৰে গিয়ে শুনল সকাল ন'টা থেকে সক্ষে ছ'টা পৰ্যন্ত টুৱ । যে-কোনও দিকেই যাক না কেন, পঁয়ত্ৰিশ টাকা ভাড়া । নথে

দেখাবে আলটিনো, দস্তা বিঠল মন্দির (সাঙ্গালি), মায়ামি লেক, মাপুসা, অঞ্জনা ও কালাংগুটে বিচ। আর সাউথে দেখাবে ওন্ড গোয়ার গিজা, মঙ্গেশ টেম্পল, শাস্তা দুর্গার মন্দির, মারগাঁও, কোলভা বিচ, মারমার্গাঁও হারবার ও ভাস্কো-দা-গামা। ওরা সাউথ গোয়ারই টিকিট পেল।

প্রথমেই ওরা এল ওন্ড গোয়ায়। এখানে ঘোড়শ শতাব্দীর গিজা ব্যাসিলিকা অব বম জিসাস ও সি ক্যাথিড্রাল দেখে মুঢ় হয়ে গেল। ব্যাসিলিকাতেই দেখল একটি সুদৃশ্য রূপোর পাতে মোড়া কাচের কফিনে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের অবিকৃত দেহ। মমি না করেও যে-দেহ আজও অবিকৃত আছে।

এর পর শাস্তা দুর্গার মন্দির দেখে ওরা এল মারগাঁও। সেখানে লাল্ল ব্রেক। ওরা একটা হেটেলে দুপুরের খাওয়া খেয়ে পায়ে হেটেই এদিক-সেন্দিক খানিকটা ঘূরে এল। তারপর আবার বাসে চেপে চলে এল কোলভা বিচ। সমুদ্রের উন্তাল তরঙ্গ দেখে মনপ্রাণ ভরে উঠল। কত ছেট-ছেট টিলা পাথর সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে উকি দিচ্ছে। বিশাল সমুদ্র তার নীল জলরাশি নিয়ে সেই টিলার পাথরে আঘাত করে উন্ধেও উল্লাসে লাহিয়ে উঠছে। পাহাড়, সমুদ্র আর বালিয়াড়ি মনকে যে এমন সুন্দর করে ভরিয়ে দেয় তা এখানে না এলে বোঝা যায় না। এর পর আবার বাস। আবার বিচ। এবারে এল মারমার্গাঁও হারবার।

তত সি-বিচ দেখল ওরা, তার মধ্যে এইখনটাই সবচেয়ে ভাল লাগল ওদের। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল। বিদেশি পর্যটক আর চুরিস্টের ভিত্তে হারবার তখন জমজমট। যেন একটা মেলা বসে গেছে। বিচের ওপর ঘোড়া ছুটছে। উটের গাড়ি মাঝ পনেরো টাকায় এ-প্রাস্ত থেকে ও-প্রাস্ত ঘূরিয়ে আনছে। সাহেব-মেমরা বৌদ্ধস্মান করছে। ক্যামেরায় ছবি তুললে মনে হবে ভারতে নয়, ভারতের বাইরেই কোনও দেশের সমুদ্র সৈকতের ছবি বোধ হয়।

বাবলু বলল, “কী সুন্দর। আকাশ, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র, মানুষ, পশু, সবই এখানে সুন্দর। সত্যি, এখানে আসব জানলে একটা ক্যামেরা অন্তত সঙ্গে আনতাম।”

সংযুক্ত বলল, “তোমরা তো কত দেখেছ। আমি এই প্রথম।

আমার মনে হচ্ছে এই দেশ ছেড়ে কখনও কোথাও যাব না আমি। বাবা সন্ট লেকে বাড়ি না কিনে যদি এখানে একটা বাড়ি কিনতেন, বেশ হত তা হলে।”

বাবলু বলল, “বিলুরা এখন কোথায় আছে কে জানে? পপুটা থাকলে ঠিক এই টেক্টোয়ের মাথায়-মাথায় নাচত।”

সংযুক্ত খুশিতে উপচে পড়ে সমুদ্রের অনেক কাছে চলে গেছে। পায়ের পাতা ভিজিয়ে ছুটোছুটি করছে।

একটা উটের গাড়ি এসে বলল, “আসবেন নাকি দিদিমণি? ওই ওদিক থেকে ঘূরিয়ে আনব।”

সংযুক্ত বাবলুর মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, “কত নেবে?”

“দশ টাকা।”

ওরা কোনওরকম দরদাম না করে উঠে পড়ল উটের গাড়িতে। গাড়িটা ওদের নিয়ে যখন অনেক—অনেক দূরে চলে গেল, তখন হঁশ হল বাবলুর। বলল, “এ কী! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি আমাদের?”

চালক কোনও কথা না বলে আরও জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলল গাড়িটা।

বাবলু চিৎকার করে বলল, “রোখো। রোখো বলছি।”

কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাবলু তখন পেছন দিক থেকে লোকটির গলা চিপে ধরতেই লোকটি বাবলুকে নিয়ে সমুদ্রের জলের ওপর পড়ল। বেশি জলে নয় অবশ্য, অল্প জলে—যেখানে আরব সাগরের লোনা জল ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছিল। বাবলু গায়ের জোরে লোকটির মুখে একটা ঘুসি মারতেই লোকটি ছিটকে পড়ল বালির ওপর। তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই আবার এক ঘা।

এদিকে চালকহীন উটের গাড়ি তখন গড়গড়িয়ে ছুটছে। তার আর থামবার নাম নেই। সংযুক্ত আগভয়ে চিৎকার করছে সেখান থেকে, “বাঁচাও। বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।”

দু'জন অশ্বারোহী ছুটে গিয়ে বহুকষ্টে কজা করল উটটাকে। তারপর যখন ওকে নিয়ে এল বাবলুর কাছে, বাবলু তখন মারতে-মারতে প্রায়

ଆধମରା କରେ ଫେଲେଛେ ଦେଇ ଲୋକଟାକେ । ଜୟଗାଟା ଯେମନ ନିଜିନ୍,  
ତେମନିଇ ମନୋରମ । ଆର ସାଗରଗର୍ଜନେ ଭରା । ଏହିକମ୍ ଯଥନ ଅବସ୍ଥା ତଥନ  
ହଠାତ୍ କୋଥା ଥେକେ ଯେନ ଚାର-ପ୍ରିଜନ ଗୋଯାନିଜ ଏସେ ହାଜିର ହଲ  
ମେଖନେ ।

একজন গায়ের জোরে সংযুক্তকে উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে। সংযুক্ত হাত-পা ছুড়ে চিংকার করে বাধা দিতে লাগল। আর বাকি যারা ছিল, তারা বাবুর দুটো হাত শক্ত করে বেঁধে টানতে-টানতে মারতে-মারতে নিয়ে চলল সেইদিকে, যেদিকে সংযুক্তকে নিয়ে গেছে। বনপথ ধরে খানিক যাওয়ার পরই ওরা বড় রাস্তায় এল। সেখানে একটা নীল রঙের চারদিক ঢাকা জেলের করোনি নিয়ে যাওয়ার মতো ভানগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা ওদের দুজনকেই সেই ভানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে চলল।

ଓৱা দুঃজনেই তখন বোৱা হয়ে গেছে। কাৰণ মুখে আৱ কথা নেই। কেন যে ওৱা দলছুট হয়ে এগিয়ে এসেছিল! ওৱা যে গোয়াৰ বিচে কোঞ্চন উপকূলে শক্রুৰ মুখৰে প্ৰাপ্তি, সে-কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। তাৰই পৰিৱাম এই।

অনেক পরে ভ্যানটা এসে যেখানে থামল সে-জায়গাটির নাম ভাস্কো-দা-গামা । ওদের ভ্যান থেকে নামাবার সময় বাবলু একটা ফলকে লেখা এই নামটা আড়চোখে দেখে নিয়েছিল । তখন সক্ষে হয়ে এসেছে । ওরা যেখানে এল সেটাও সমুদ্রতীর । সেখানে সমুদ্রের ধারে বালির চড়ায় সারি-সারি কত যে নৌকো নোঙ্গ করা আছে, তা আর ঠিক নেই । আর আছে অনেক জাহাজ । এই বন্দরে জাহাজ মেরামতি হয় । এটা একটা জাহাজঘাটা । এখান থেকে জাহাজ ছাড়ে । কী বিশাল তার ব্যাস্তি । তবে জায়গাটা বড়ই অপরিচ্ছন্ন । শুটকি মাছের আঁশটে গাঁকে গা বমি-বমি করছে । লোকগুলো ওদের দু'জনকে ভ্যান থেকে নামিয়ে গায়ের জোরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল । সংযুক্তার হাতের নড়া ধরে টেনে-ছিড়ে নিয়ে চলল ওরা । বাবলুর অবস্থা ও তাই । ওর দু' হাত বাঁধা । তার উপর দু' দিক থেকে দু'জন শক্ত করে ধরে আছে ওকে । এখানে আরও যেসব গোয়ানিজরা ঘূরে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেদের ভাষায় ১২৬

କେ କି ଯେ ବଲଛେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିତେ ପାରିଲା ନା ଓରା । ତବେ ଏଟୁକୁ ବୁଝିତେ ପାରିଲା, ଓରା ନିଶ୍ଚଯିଇ ଓଦେର ଦଲେର ଲୋକ । ତାଇ ଓଦେର ସାହୟା ବା ଉଦ୍ଧାର କରିତେ ଆସା ଦୂରେର କଥା, ଦିବି ଦାଙ୍ଗିଯେ-ଦାଙ୍ଗିଯେ ମଜା ଦେଖିଛେ ସବ । କେଉଁ-ବା ହାସିଛେ । ତବୁଓ ବାବଲୁ ଓଦେର ହାତ ଥେକେ ନିଜେକେ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଆଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିଲ । କେନନା ଏକବାର ଯଦି ଓଦେର କବଳ ଥେକେ ଛାଡ଼ା ଓ ପାଯ ଆର ହାତେର ବୀଧିନ ଯଦି ଖୁଲିତେ ପାରେ, ତା ହଲେ ମଜା କାକେ ବଲେ ଦେଖିଯେ ଦେବେ ଓଦେର ।

যেতে-যেতে এক জায়গায় হঠাতেই দুটো বড় নৌকোর মাঝখানে এসে পড়ল ওরা । নৌকো দুটো ভাঙা । মেরামতি হচ্ছিল । যে লোক দুটো বাবলুকে টেনে আনছিল তারা কাদের সঙ্গে কী যেন কথা বলতে গেল । যেই না যাওয়া বাবলু অমনই হেঁচকা একটা টানে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল নিজেকে । তারপর তীরের মতো ছুটে চলল বেলাভূমি ধরে । ওরাও তাড়া করল । সূর্য দুবে গেলেও দিনের আলো তখনও মুছে যায়নি আকাশের পট থেকে । বাবলু কয়েকটি ভাঙা নৌকোর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে গায়ের জোরে বাঁধন-দড়িটা ঘথতে লাগল নৌকোর ঘোলে । খুব একটা বজ্র আটুনি ছিল না । তাই অর চেষ্টাতেই খুলে গেল বাঁধনটা । আর ওকে পায় কে ? বাবলু কুন্দ মূর্তি ধরে এগিয়ে গেল এবার । যে-লোকটা প্রথমেই এল, বাবলু তাকেই লক্ষ্য করে শুলি করল একটা । লোকটা বিকট চিকির করে বসে পড়ল সেখানে । গুলিটা পায়েই নেগেছে । তাই যন্ত্রণায় পা ছুড়ে ছাটফট করতে লাগল ।

ବାବଲୁ ତଥନ ବନ୍ଦରେର ଲୋକାଲୟେର ଦିକେ ଛୁଟିଛେ ।

ওদিকে সংযুক্তাও ঝুটছে ওদের তাড়া খেয়ে। সেও বছ কটে ছিনিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ঝুটতে-ঝুটতে বাবলুকে দেখতে পেয়েই চিংকার করে ডাকল, “বা-ব-লু-উ-উ !”

যেই না ঢাকা অমনই অনেক দূর থেকে উত্তর এল, “ভো !  
ভো-ভো-উ-উ-উ !”

থমকে দাঁড়াল বাবলু । এ তো পঞ্চুর গলা । পঞ্চু এখানে কোথা থেকে এল ? বাবলুও তখন ডাকল, “প-ন-চু-টি ।”

এদিকে বাবলুকে ধরবার জন্য তখন আট-দশজন ছুটে আসছে। সংযুক্তির দিকেও দু-তিনজন।

আর ওদের থেকেও অনেক বেশি জোরে অনেক হিংস্র হয়ে ছুটে আসছে পঞ্চ। শুধু পঞ্চ নয়, পঞ্চর হাঁকড়াকে আকৃষ্ট হয়ে যেখানে যত কুকুর ছিল সবাই আসছে। এসেই বাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর।

বিলু এসে বাবলুকে জড়িয়ে ধরল আনন্দের উচ্ছ্঵াসে। তারপর বলল, “আমরা এখানে সবাই আছি বাবলু। আর কোনও ভয় নেই। আলবুকার্ক এখানেই আছে। আর অনেকদিন পর ওকে এখানে পেয়ে পুলিশও ওত পেতে আছে চারদিকে। হয় আমাদের হাতে, নয় পুলিশের হাতে মরণ ওর অনিবার্য।”

বিশ্বিত বাবলু বলল, “কিন্তু তোরা এখানে কী করে এলি ?”

বিলু বলল, “সেসব কথা পারে বলব। সংক্ষেপে একটু শুধু শুনে রাখ, পুনের পার্বতী মন্দিরের কাছ থেকে ওরা আমাদের ধরে নিয়ে আসছিল। পঞ্চকে একটা মাছধরা জালে আটকেছিল তাই। না হলে ধরতেই পারত না আমাদের। ভাগ্য ভাল যে, পঞ্চকে ওরা ফেলে আসেনি। পথে আসতে-আসতে ওদের আলোচনা যা শুনেছি তাতে ধীরণা হয়েছে, ওরা আমাদের ভয় দেখিয়ে ওদের দলের হয়ে কাজ করাবে এবং পঞ্চকে আমাদের মারফত পেলে ওদের নাকি অনেক সুবিধে হবে চুরি-ভাক্তির। আমরা যখন ওদের সঙ্গে লোভার কাছাকাছি এসেছি, তখন হঠাতে পুলিশের তাড়া যেয়ে পালায় ওরা। একজন শুধু পালাতে পারেনি। ধরা পড়ে পুলিশের হাতে বেদম মার যেয়ে সব কথা ধীকার করেছে। আলবুকার্কের জাহাজ রেডি। তাতে করেই সবাইকে নিয়ে চলে যাবে অনেক দূরে। এইসব শুনে আমরা আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছিলুম বিকেল থেকে। ঠিক সময়েই আমরা যেই একটু দূরে গেছি অমনই ওরা নিয়ে এসেছে তোদের। পুলিশ শুধু আলবুকার্ককে নয়, তোদেরও খৌজ করছে। কিন্তু তুই একা কেন ? সংযুক্তি কই ? সে কোথায় গেল ?”

বাবলু বলল, “এই তো ছিল। ওর ডাক শুনেই তো সাড়া দিল পঞ্চ।”

ওদিকে তখন কুকুর-মানুষে দর্শণ শুরু বেধে গেছে। পঞ্চ এক-একজনের ঘাড়ে বাঁপিয়ে পড়ছে, কামড় দিছে, পরক্ষণেই লাফিয়ে পড়ছে আর-একজনের ঘাড়ে।

বাস্তু, বিছু আর ভোঞ্চল কাঠের পাটাতন, বাঁশ, যা পাছে তাই দিয়ে পেটাছে যে সামনে আসছে তাকে।

সংযুক্তি আর কেয়া কী যে করবে, ভেবে পেল না। ওরা দেখল চারদিক থেকে চারজন ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। কেয়া কারাটে জানে। তারই পাঁচাচে নিজেকে বারবার মুক্ত করতে লাগল সে। কিন্তু সংযুক্তি অসহ্য। দীর্ঘদেহী একজন ওকে ভীষণ আঘাত করে কাঁধের ওপর শুইয়ে নিল। সংযুক্তির বাধা দেওয়ার মতো এতকুশ শক্তিও আর রইল না তখন। লোকটা ওকে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল জাহাজঘাটার দিকে।

বিলু ভোঞ্চলকে বলল, “তুই চট করে একটু খবর দে পুলিশকে। পুলিশ আশেপাশেই আছে।”

ভোঞ্চল বলল, “পুলিশে খবর দেওয়ার সময় নেই। ওই দ্যাখ বাস্তু, বিশু আর কেয়াকে তুলে নিয়েছে ওরা। যেভাবেই হোক, ওদের অটিকাতেই হবে। না হলে একবার যদি জাহাজে ওঠায়, তখন হয়তো কিছুই করা যাবে না।”

বাবলু বলল, “তোরা ওদিকে যা, আমি এদিক দেখছি। পঞ্চকেও নিয়ে যা তোরা।”

পঞ্চকে নিয়ে যেতে হল না। সে নিজেই ছুটে গিয়ে বাঁপিয়ে পড়ল। পঞ্চের দেখাদেখি অন্য কুকুরগুলোও তাড়া করল ওদের। পলায়মান লোকগুলোকে গোল করে ঘিরে ফেলল তারা। ওদের দু-একজনের কাছে আগ্রহ্যান্ত থাকলেও তা যাবহার করতে পারল না। কত কুকুর মারবে ? ছুটতে গেলে পায়ে কামড়ায়। বন্দুক ধরলে, হাতে। কেয়া তো রাগের মাথায় একজনের চুলের মৃষ্টি ধরে ঝাকাছে, “বল শয়তান, আর কখনও মেয়েদের গায়ে হাত দিবি ?” যাকে বলা হচ্ছে সে ওর ভাষা বুঝছে কিনা কে জানে ? শুধু হাত জোড় করে বলছে, “নেই, নেই, নেই।”

বিচ্ছু একজনের চোখে এমন আঙুল গঁজে দিয়েছে যে, চোখ দিয়ে টপ্টপ করে রাত্তি ঝরছে তার। আর বাচ্চ চোখেমুখে বালি ছুড়ে প্রায় অর্ধেক অঙ্ক করে দিয়েছে কয়েকজনকে।

এই অবস্থায় দিয়ে পড়ল বিলু আর ভোম্বল। ওদের হাতে একটা করে বাঁশ আর চালা কঠ। মারতে মারতে প্রত্যেককে প্রায় আধমরা করে দিল। মজার ব্যাপার এই যে, দূরে দাঁড়িয়ে অনেকে সব কিছু দেখলেও বাধা দিতে বা ছাঁড়িয়ে নেওয়ার জন্য এগিয়ে এল না কেউ। ওদের দলেরও কেউ-কেউ কুকুরের কামড় খাওয়ার ভয়ে গা-ঢাকা দিল।

ওদিকে বাবলু তখন একা পড়ে গেছে আলবুকার্কের কাছে। হাতে পিস্তল, তবু গুলি করতে পারছে না। যদি লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, সংযুক্তির গায়ে লেগে যায়? ওর পায়ে আঘাত করে গুলিও করতে পারছে না। মুখ খুবড়ে পড়ে গেলে সংযুক্তির ক্ষতি হবে। আবার খুব সামনেও এগোতে পারছে না, কেননা, ওর হাতে উন্নত রিভলভার।

এই অবস্থায় পঞ্চ ছাড়া গতি নেই। বাবলু মুখের দু'পাশে হাত রেখে চিংকার করে ডাকল, “প-ন-চু-ট্র-ু-।”

বাবলুর ডাক কানে গেলে আর কি পঞ্চ থাকতে পারে? সে তখন সব ছেড়ে সেই চুরুকুহের ভেতর থেকে লাফিয়ে ছুটে এল বাবলুর দিকে। সন্দের অঙ্ককার তখন ঘনিয়ে এসেছে। বন্দরের জাহাজগাটায় আলোর রোশনাই। কোথাও আলো, কোথাও অঙ্ককারে জায়গাটাও বিভীষিকামূল। বাচ্চ, বিচ্ছু, কেয়া আর ভোম্বলকে সেই যেোও করা লোকগুলোর কাছে রেখে বিলুও ছুটে এল বাবলুকে সাহায্য করতে।

পঞ্চ ছুটতে-ছুটতে এসেই একটা ভাঙা নৌকোর খোলের ওপর উঠে শিরদাড়া টান করে একবার শুধু দেখে নিল বাবলু কেন দিকে আছে। তারপরই সমুদ্রের চেউয়োর শব্দকেও চমকে দিয়ে ভীষণ গর্জনে সাইক্রনের মতো ছুটে চলল আলবুকার্কের দিকে।

বাবলু চিংকার করে বলল, “আলফানসো! একবার ফিরে দেখো তোমার যম কীভাবে মৃত্যুর শৰ্মন নিয়ে তোমার দিকে ছুটে যাচ্ছে। গো আয়েড পঞ্চ। ওই শয়তানটাকে তুই উপযুক্ত শিক্ষা দে।”

বন্দরের আধো আলো, আধো অঙ্ককারে আলবুকার্কের মুখ কুটিল হয়ে

উঠল। এতক্ষণে বুঝি সামুদ্রিক বাতাসে বিপদ্বের গফ পেল সে। তাই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পঞ্চকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। সন্দের অঙ্ককারে সামুদ্রিক পাখিরা ভয়কর কলরবে আকাশে উড়ল। আকাশময় সাদা খয়েরি ভানা মেলে ঘুরপাক খেতে লাগল। এই অবস্থায় পঞ্চ জানে কী করে আঘাতরক্ষণ করতে হয়। তাই ও এমন একটা ভল্ট খেল যে, গুলিটা ওর গায়ে না লেগে লাগল একটা নৌকোর খোলে।

আলবুকার্ক খেমে পড়ায় বাবলুর দুবিধে হয়েছে। সংযুক্তি ও তখন ছটফট করছে ওর কাঁধের ওপর। আলবুকার্ক আবার পঞ্চের দিকে রিভলভার তাগ করতেই বাবলুর পিস্তল শিস দিয়ে উঠল, ‘ডিস্ম’।

মুখ খুবড়ে পড়ে গেল আলবুকার্ক।

যেই না পড়া, সংযুক্তি অমনই নিজেকে মুক্ত করে ছুটে এল বাবলুর কাছে।

খাপা কুকুরের মতো আলবুকার্ক তখন ওদের দু'জনের দিকেই রিভলভার তাগ করল। বিলু তখন ওর হাতের চালা কাঠখানা ছুড়ে মেরেছে আলবুকার্কের মুখে। আর পঞ্চও এক নাফে কামড়ে ধরেছে ওর হাতের কঙ্গিটাকে। বন্দ্রণায় আর্টিনাদ করে উঠল আলবুকার্ক।

বাবলু গিয়ে ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিল। বাবলু বলল, “তুমি ভুল করলে আলফানসো! হাতি সব সময় পাঁকে পড়েই জন্ম হয়। এই কথাটা বোধ হয় তুমি ভুলে গিয়েছিলে।”

বিলু তখন কাঠখানা কুড়িয়ে আবার যখন ওকে মারবে বলে হাত উঠিয়েছে, তখন কে যেন ধরে নিল ওর হাতটাকে।

আলবুকার্ক দেখল গোয়ার পদছু পুলিশ অফিসার। ওর জন্য বিশ্বেতাবে তৈরি হাতকড়া নিয়ে ধীরে-ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছেন। আর দলে-দলে পুলিশ এসে ওর দলের লোকেদের কোমারে দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে ওর দিকে। কত পুলিশ এগিয়ে জলেছে ওর নামাকিত আলবুকার্ক জাহাজের দিকে। আলবুকার্ক উত্তাদের মতো চিংকার করলে লাগল, “না-না-না-না।” কিন্তু ওর সেই কষ্টস্বর সাগর তরঙ্গে ভেসে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

তোপ্ল, বাচ্চ, বিচ্ছু, কেয়া, সবাই তখন এমে গেছে। বিলু তো

କହେଇ ଆଛେ ।

ରଗଙ୍କାନ୍ତ ବାବଲୁ ବଲଲ, “ଯାକ । ଆମାଦେର କାଜ ଶେଷ । କୁଖ୍ୟାତ ଆଲ୍ୟକାର୍କଙ୍କେ ଆମରା ଯେ ଜ୍ୟାଣ ଧରିଯେ ଦିତେ ପେରେଛି, ଏତେଇ ଆମରା ଖୁବି । କୋଟି-କୋଟି ଟାକର ସୋନାଓ ବିଦେଶେ ପାଚାର ହତେ ପାରିଲା ନା । ଅରା ଅନେକ କିନ୍ତୁଇ ହ୍ୟାତୋ ଧରା ପଡ଼ିଲ । ଏଥିନ ଚଲ, ଆମରା କୋଖାଓ ଦିଯେ କୋନ୍ତା ଏକଟା ହେଟେଲେ ଉଠେ ରାତଟା କାଟିଇ । ତାରପର ଦିନକାନ୍ତକ ଥେକେ ଗୋଯାଟି ଭାଲ କରେ ଧୂରେ ନିଯେ ତବେଇ ବାଡ଼ି ଫିରିବ ।”

ଏକଜନ ପୁଲିଶ ଅଫିସର ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲାଲେନ, “ସେଜନ ତୋ ଆମରା ଆଛି ଭାଇ । ତୋମାଦେର ଗୋଯା ଦେଖାନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ବ ଆମାଦେର । ଏଥିନ ଚଲୋ, ଆମର ବାଖଲୋ ଯେ ତୋମାଦେର ନିଯେ ଯାଇ । ଆମାର ଛେଲେମେରୋ ତୋମାଦେର ଦେଖିଲେ ଖୁବ ଖୁବି ହବେ ।”

ବିଶ୍ଵିତ ବାବଲୁ ବନଲ, “ଆପଣି ବାଙ୍ଗାଳି ?”

“ଶୁଣୁ ଆମି ନାହିଁ । ଗୋଯା, ବିଶେଷ କରେ ଏହି ଭାକୋ-ଦା-ଗାମାର ପ୍ରତ୍ୟାମି ବାଙ୍ଗାଳି ଆଛେନ । ଅନେକେର ସମେଇ ଆଲାପ କରିଯେ ଦେବ ତୋମାଦେର । ଦେଖିବେ ଏଥାନେତେ ତୋମାଦେର ଆଦର କତ ।”

ପାଞ୍ଚ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାଦେର ମୁଖ ଖୁବିତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଲେ ଉଠିଲ । ଏହି ଆନନ୍ଦେର ମଧ୍ୟେତେ କୋନ୍ତା ଏକ ଫିଲେ ସଂୟୁକ୍ତାକେ ଓର ବାବର ମୃତ୍ୟୁ ସଂବାଦଟି ଦିତେ ହବେ । ଆର ଟେଲିଫୋନ ଗାଇଡ ଦେଖେ ନାଶିକେ ଡାଃ ଅନନ୍ଦମୋହନକେଣେ ଜାନାତେ ହବେ ବ୍ୟାପାରଟା । ସଂୟୁକ୍ତାର ଏହି ବିପଦେ ତିନି ନିଶ୍ଚଯାଇ ଓର ପାଶେ ଏସେ ଦାଢ଼ାବେନ ।

ଓରା ସଥିନ ପୁଲିଶେର ଗାଡ଼ିତେ ଉଠିଛେ, ତଥାନ ପଢ଼ିର ମହ୍ୟୋଗୀ ମେଇ କୁକୁରଙ୍ଗଲୋ ଛୁଟେ ଏସେ କୁଇ-କୁଇ କରେ କୀ ଯେନ ବଲଲ ପଢ଼ିବେ ।

ପ୍ରତ୍ୟାମରେ ପଢ଼ିର ଦିକେ ତାକିଯେ ଏକବାର ଶୁଣୁ ଡେକେ ଉଠିଲ,  
“ତୋ । ତୋ ତୋ ।”

---

**ব**ডিনের ছুটিতে বাজুরীদের সঙ্গে  
বাড়ির কাছাকাছি একটি নদীর ধারে  
পিকনিক করতে গিয়েছিল  
সংযুক্ত—স্কুল-পড়া এক কিশোরী।  
সবাই ফিরল, ফিরল না শুধু সংযুক্ত।  
রহস্যজনকভাবে উধাও।  
দিন কয় বাদে নদীর জলে ভেসে উঠল  
তার মৃতদেহ।  
একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে সংযুক্তৰ  
মা-বাবা শোকে পাথর।  
এরপর যা ঘটল তা প্রায় অবিশ্বাস্য।  
নানা ঠিকানা থেকে সংযুক্তার নিজের  
হাতে পেরু চিঠি আসতে শুরু করল  
বাড়িতে।  
কী করে হয় ?  
তবে কি মরেনি সংযুক্ত ? কার মৃতদেহ  
সংকৰন করে এলেন তার মা-বাবা ?  
নিজেদের একমাত্র মেয়েকে চিনতে  
তাদের এত ভুল হবে ?  
পাণ্ডব গোয়েন্দাৰা এতকাল যত  
রহস্যদেহই করে থাক—সংযুক্তৰ এই  
'মৃত' ও 'বেঁচে-ওঠা'ৰ ব্যাপারটাই সব  
থেকে জাটিল এক রহস্য, এতে সন্দেহ  
নেই। অগত্বজ্ঞতপূর্ব থেকে বজাবজা,  
বামটেক থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত  
এবারের দৃঃসাহসিক অভিযান।  
অবশ্যে কীভাবে শুল্প সব রহস্যৰ  
জট, তারই দুর্দান্ত কাহিনী 'পাণ্ডব  
গোয়েন্দা'ৰ এই দশম খণ্ডে।



**জ**ন্ম : ২৫শে ফাল্গুন ১৩৪৭।  
ইরাজী ১৯৪১। মধ্য হাওড়া  
বামকৃষ্ণপুরে, খুলুট যষ্টীতলায়।  
কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য সাধনার  
শুরু। পলাতক। ভবগুরে। কৈশোর ও  
মৌবনের সঙ্গিক্ষণে বৈত্তিমতো।  
সাধসঙ্গ। এখন ঘোর সমস্যী। ১৯৬১  
সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার  
বিবিসারীয় আলোচনার সঙ্গে  
লেখালেখি সৃতে যুক্ত ধারকেও ১৯৮১  
সালে প্রকাশিত ছোটদের জন্য লেখা  
প্রথম বই 'পাণ্ডব গোয়েন্দাই' লেখককে  
সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শিক্ষাগত যোগাতা  
ইউনিভার্সিটিৰ চোকাট পর্যন্ত। নেশা  
তীর্থ, পর্যটন।  
এই লেখকের ভূমণ বিষয়ক প্রতিটি  
রচনাই দেশে প্রকাশিত হয়েছে।  
আরাধ্য গৃহদেবতার কৃপায় এ পর্যন্ত  
প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা মোট  
ছান্বিশটি।